বিশ্বের ইতিকথা

পশ্চিমবঙ্গ
রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়
শিক্ষক সমিতি

॥ নিবেদন ॥

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক ১৯৭৯ সাল থেকে নব-প্রবর্তিত সিলেবাস অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি কর্তৃক সম্পাদিত ষষ্ঠ শ্রেণীর ইতিহাস পুস্তক 'বিশ্বের ইতিকথা' প্রকাশিত হল। নব-প্রবর্তিত ইতিহাস বিষয়ক সিলেবাসের মূল উদ্দেশ্য ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের পথরেখার সঙ্গে পরিচয় ঘটানো। আজকে সভ্যতার নামে জাত্যভিমান, গোষ্ঠীতান্ত্রিকতা, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি সঙ্কীর্ণতাবাদ যেভাবে আত্মপ্রকাশ করছে তাকে শুরুতেই প্রতিরোধ করতে না পারলে আগামী দিনের সঙ্কট থেকে দেশ, জাতি, ধর্ম, সংস্কৃতি কিছুকেই নিরাপদ করা যাবে না। তাই তরুণ শিক্ষার্থীকে বিশ্বসভ্যতার সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেবার এত প্রয়োজন। ইতিহাস সম্পর্কে কৌতূহল ও অনুরাগ জাগানোর দায়িত্ব শিক্ষক ও গ্রন্থ রচয়িতার। বিষয়টিকে বস্তুভিত্তিক করে পরিবেশন করাও প্রয়োজন এবং শিক্ষার্থিগণ তাদের জ্ঞান ও তথ্যের ভিত্তিতে চিন্তা করতে শেখে তাও দেখা দরকার। এই উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ রেখেই আমাদের অভিজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দ এই পুস্তক রচনায় ব্রতী হয়েছেন। এখন যাদের জন্য এই ইতিহাস পুস্তকখানি সম্পাদিত হয়েছে, একমাত্র তাদের পূর্ণ প্রয়োজন সিদ্ধ হলেই এই প্রচেষ্টা সার্থক বলে গণ্য হবে। পুস্তকটিকে আরো সুন্দর ও সুষ্ঠু করার জন্য সর্ব প্রকার পরামর্শ কৃতজ্ঞচিত্তে গৃহীত হবে।

এই প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করায় সমিতি বাসন্তী প্রেস কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে।

কলিকাতা
২১শে জুন, ১৯৭৯

সাধারণ সম্পাদক
পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

বিশ্বের ইতিকথা

মানব সভ্যতার আদিকেন্দ্র
মেসোপটেমিয়া, হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং ইত্যাদি।

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পর্ব ঃ ইতিহাস পড়ব কেন ?

পৃথিবীতে মানুষ কখন এসেছে জান ?

জীবজগতের ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে মানুষ এসেছে কমপক্ষে পাঁচ লক্ষ বছর আগে। এই পাঁচ লক্ষ বছরের চেষ্টার পর চেষ্টায় মানুষ অন্যান্য জীব থেকে নিজেকে প্রথমে আলাদা করে নিয়েছে। তারপর শুরু করেছে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার লড়াই। এই লড়াই-এ তার সাফল্য সম্ভব হয়েছে বুদ্ধি ও চেষ্টার দ্বারা এবং তার হাত ও শ্রমের মিলিত শক্তির দ্বারা। এর সাহায্যে একদিকে সে যেমন বিপরীত অবস্থার মধ্যেও নিজেকে রক্ষা করার সংগ্রাম চালাতে পেরেছে হাতিয়ার তৈরি করে, অপরদিকে তেমনি সেই হাতিয়ার তৈরির কৌশল পরের যুগের মানুষকে জানাতে পেরেছে ভাষার সাহায্যে। ভাষার সাহায্যে মানুষ তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে বংশধরদের জানাবার সুযোগ পেয়েছে। ফলে এক যুগের মানুষ যেখানে শেষ করেছে, পরের যুগের মানুষ শুরু করেছে সেখান থেকে। এইভাবেই মানুষের জয়যাত্রা নতুন নতুন স্তর অতিক্রম করে বর্তমান অবস্থায় এসেছে। একথা তাই সহজেই বলা যায় যে মানুষের পাঁচলক্ষ বছরের বুদ্ধি ও শ্রমের ফসল আজকের দিনের মানুষ আর তার সভ্যতা। সেজন্য এই সভ্যতার ভাল পরিচয় জানতে হলে জানতে হবে আমাদের এই বিপুল অতীতকে—মানব জাতির এই পাঁচ লক্ষ বছরের ইতিহাসকে। ইতিহাস চর্চার প্রধান প্রয়োজন এদিক দিয়েই।

আবার, মানুষের শরীরের গড়ন যেমন বিশেষ কতকগুলি নিয়ম মেনে চলে, মানুষের সমাজের গড়নও তেমনি নির্দিষ্ট কতকগুলি নিয়ম মেনে চলে। মানুষের সমাজের প্রধান প্রধান এই নিয়মগুলিও ইতিহাস-চর্চার সাহায্যে আমরা বুঝতে পারি। এদিক দিয়ে বিচার করলে জটিল এবং বিশাল এই মানব-সমাজ সম্ভবতঃ মানব-বিজ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শাখা।

দ্বিতীয় পর্ব ঃ প্রাচীনদের সম্বন্ধে জানবার উপায়

অনেকগুলি যুক্তি ও তথ্যের উপর নির্ভর করে ঐতিহাসিকরা ঠিক করলেন যে মানব-জাতির বয়স কমপক্ষে পাঁচ লক্ষ বছর। মানুষ লিখতে শিখেছে মাত্র হাজার পাঁচেক বছর আগে। ফলে সেই সুদূর অতীতের মানুষকে জানবার মত কোন লিখিত উপকরণ পাওয়া সম্ভব নয়। এজন্য আমাদের সেই আদিম পূর্বপুরুষদের চিন্তা-ভাবনা, তাদের সমাজের গড়ন, তাদের কর্মধারা ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংবাদ ভূগর্ভ থেকে তুলে আনা বিভিন্ন নিদর্শন থেকে সংগ্রহ করতে হয়েছে। এই নিদর্শনগুলির মধ্যে আবার সবচেয়ে বেশি তথ্য পাওয়া যায় সে কালের হাতিয়ার থেকে।

মানব-জাতির শৈশব কেটেছে হিংস্র জন্তু জানোয়ারপূর্ণ প্রতিকূল এক পরিবেশে। সেখানে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মানুষকে কঠিন সংগ্রাম চালাতে হয়েছে ধারাবাহিকভাবে। অন্যান্য জানোয়ারদের দেহে স্বাভাবিক যে অস্ত্রসজ্জা রয়েছে মানুষের তা' নেই। ফলে প্রথমদিকে মানুষকে খুবই অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। অবশ্য মানুষ খুব দ্রুত এই অবস্থার পরিবর্তন করেছিল তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক ক্ষমতাকে কৃত্রিমভাবে বাড়িয়ে তুলে। মুক্ত হাত দুটিতে সে তুলে নিল আত্মরক্ষার অস্ত্র বা হাতিয়ার—প্রথম যুগে যা ছিল নিতান্তই সাদামাটা ধরণের কিছু পাথরের টুকরো, পরে ধীরে ধীরে এই হাতিয়ার মানুষের হাতকে অনেক লম্বা, নখকে অনেক ধারালো করে তুলল। মানুষের আত্মরক্ষার শক্তি শুধু বাড়ল না, বাড়ল মানুষের আক্রমণের ক্ষমতাও। মাথা খাটিয়ে মানুষ তার হাতিয়ারের যত উন্নতি করেছে তত বেড়েছে তার দৈহিক ক্ষমতা। এভাবে আত্ম-রক্ষার বিষয়ে নিশ্চয়তা বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে অন্য একদিকে তাগাদা বেড়েছে। তা' হ'ল জীবনকে বিকশিত করে তোলার দিক। শুরু হয়েছে মানুষের সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ।

আজ পর্যন্ত মানুষ যত রকমের হাতিয়ার ব্যবহার করেছে, সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যেও পরিবর্তনের ছোঁওয়া লেগেছে, তার উৎকর্ষের পরিবর্তন ঘটেছে। সমাজ বিজ্ঞানীরা বলেন যে হাতিয়ারের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সমাজের গঠনেরও পরিবর্তন ঘটেছে। সেজন্যই হাতিয়ারের ক্রমবিকাশকে অনুসরণ করে অগ্রসর হলে আমরা মানুষের চিন্তা ভাবনা, তার ধ্যান-ধারণা, তার প্রয়োগ রীতি ও কারিগরি কৌশলের বিবর্তনকেও বুঝতে পারব। প্রত্নতত্ত্ববিদরা মাটি খুঁড়ে তুলে আনলেন মানুষের করোটিকা, আর সেই মানুষের ব্যবহৃত হাতিয়ার। ভূতত্ত্ববিদরা মাটির সেই স্তরের বয়স জানালেন, নৃতত্ত্ববিদ মানুষের মুখের আদল, দেহের গড়ন ও মানসিকতার ইঙ্গিত দিলেন, প্রত্নতত্ত্ববিদ হাতিয়ারের নির্মাণ কৌশল ব্যাখ্যা করলেন এবং ঐতিহাসিক এই তথ্যগুলিকে ব্যাখ্যা করে সমাজ-বিবর্তনের একটি বিশেষ স্তরকে আলোকিত করে তুললেন। এভাবেই আদিম মানুষের ইতিহাস রচনায় হাতিয়ার একটি প্রধান উপাদান হয়ে উঠেছে।

অবশ্য আদিম মানুষের সামাজিক সংগঠনের আর তার ধ্যান-ধারণা ও মতাদর্শের আরও বিশদ পরিচয় জানার জন্য আজকের সমাজ-বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা আদিবাসীদের মধ্যে অনুসন্ধান চালিয়েছেন। আদিম মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে এই আদিবাসীদের জীবনযাত্রায় কোথাও কোথাও মিল খুঁজে পেয়েছেন তাঁরা। এভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে, মানব সভ্যতার আদিপর্বের ইতিহাস রচনায় লাগতে পারে, এমন আরও কিছু মূল্যবান উপকরণ।

হাতিয়ারের পরিবর্তনকে সমাজ-বিবর্তনের নির্দেশক হিসাব ধরে নিয়ে সমাজ-বিজ্ঞানীরা মানব-সভ্যতাকে তিনটি যুগে ভাগ করেছেন। প্রথম যুগকে প্রস্তর যুগ, দ্বিতীয় যুগকে ব্রোঞ্জযুগ ও তৃতীয় যুগকে লৌহযুগ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পর্ব ॥ আদি মানব

প্রথম পাঠ : খাদ্য সংগ্রাহক মানব গোষ্ঠী

প্রাইমেট্স — এই ইংরাজি শব্দটি দ্বারা বানর, বনমানুষ আর মানুষ এই তিন ধরণের জীবকে বোঝানো হয়। এই জীবগোষ্ঠীর ক্রমবিকাশ শুরু হয় 'লেমুর' নামের জীবটি থেকে এবং শেষ হয় 'মানুষ' নামক জীবে। ক্রমবিকাশের এই ধারায় লক্ষণীয় যা তা হ'ল প্রাইমেটদের মগজ ক্রমেই বৃহৎ ও জটিল হয়ে উঠছে আর সেই সঙ্গে কমে যাচ্ছে দেহের স্বাভাবিক অস্ত্র সজ্জা—বানরত্ব কমছে, বাড়ছে নরত্ব।

বানরের আকৃতি বিশিষ্ট প্রথম মানুষের সন্ধান পাওয়া যায় চীনের চাউ-কাউ-তিয়েন গুহায়। এই মানুষদের বলা হয় 'পিকিং মানুষ'। নাতিদীর্ঘ এই মানুষগুলি দুপায়ে ভর দিয়ে, সামনের দিকে একটু ঝুঁকে চলাফেরা করতে পারত। ঠুকে ঠুকে ধারালো করা পাথরের টুকরো, জন্তু জানোয়ারের হাড় আর হরিণের শিং ছিল এদের বন্য প্রাণী শিকারের অস্ত্র। ফলমূল সংগ্রহ করে আর বন্যপ্রাণী শিকার করে এরা খাদ্যের সংস্থান করত। আগুন জ্বালাতে না জানলেও আগুনের ব্যবহার যে এরা জানত তার প্রমাণ পাওয়া গেছে এদের গুহায়। এদের মাথার খুলির মধ্যে এমন কিছু চিহ্ন পাওয়া গেছে যা থেকে বলা যায় খুব প্রাথমিক ধরনের কোন ভাষার চলন ছিল এদের মধ্যে।

দ্বিতীয় পাঠ : পুরানো পাথরের যুগ

শেষ পাঁচ হাজার বছর বাদে পাঁচ লক্ষ বছরের পুরানো মানব সভ্যতার সবটুকু সময় কেটেছে পাথরের যুগে। অবশ্য এই দীর্ঘ

সময়ের মধ্যে ক্রমবিকাশের প্রবাহ অব্যাহত থেকেছে। ধাপে ধাপে পাথরের হাতিয়ার—গোড়াতে যা ছিল নিতান্তই মামুলি একখণ্ড পাথরের পরে তা হয়ে উঠেছে হাতকুড়ুল, ছুরি, ছোরা এবং শেষ পর্যায়ে লাঠির মাথায় হাড়ের ফলক লাগানো বর্শা। মানুষের হাতিয়ারের শক্তি গেছে বেড়ে। গোড়ার দিকে সব রকম কাজের জন্য একই ধরনের হাতিয়ারের চল থাকলেও পরে আমরা দেখি মানুষ ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হাতিয়ার ব্যবহার করছে। এই যুগের মাঝা
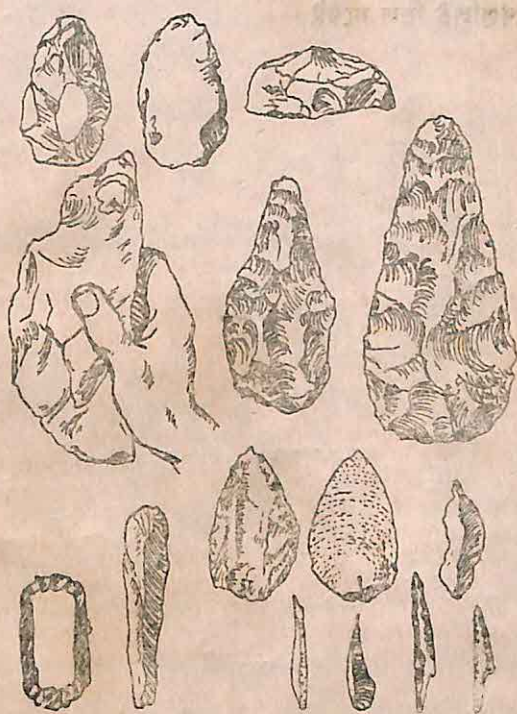
পুরানো প্রস্তর যুগের অস্ত্রশস্ত্র

মাঝি সময় দেখা যায় হাতকুড়ুলগুলির হাতলে কিছু শিল্পকর্মের ছাপ। এই সময়ে বিভিন্ন জায়গার আদিম মানব-গোষ্ঠী প্রায় একই ধরনের হাতিয়ার ব্যবহার করছে দেখে অনুমান করা যায় যে এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে হয়ত কোন এক ধরনের যোগাযোগ ছিল।

বাকলের পোশাক ছেড়ে চামড়ার পোশাক ধরতে মানুষ বেশি সময় নেয়নি। ধীরে ধীরে যা শিখেছে তা হল গায়ের মাপে চামড়া কেটে নিয়ে হাড়ের সূঁচ আর গাছের বাকলের সুতো দিয়ে তা জুড়ে নিতে। গোড়ার দিকে প্রাকৃতিক গুহাগুলি ছিল মানুষের আশ্রয়। পরে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে বাঁশ, লতাপাতার ছাউনি দিয়ে আদিম মানুষ তার গৃহস্থালি সাজিয়েছে। শিকার আর সংগ্রহের তাগিদে মানুষকে স্থান থেকে স্থানান্তরে ছুটে বেড়াতে হ'ত। অস্থির যাযাবর জীবনে এই উপকরণগুলিই ছিল যথেষ্ট।

দ্বিতীয় পর্ব ॥ নতুন পাথরের যুগ

প্রথম পাঠ ঃ হাতিয়ারের ক্রমোন্নতি

এ যুগে মানুষ তার হাতিয়ারগুলি ঘষে-মেজে ধারালো বা ছুঁচলো করে নিতে শিখেছে। কুড়ুলে আর কোদালে হাতল লাগিয়েছে। কৃষি-কৌশল আয়ত্তে আসার সঙ্গে সঙ্গে কাটা, খোড়া ছেঁচা, চষা
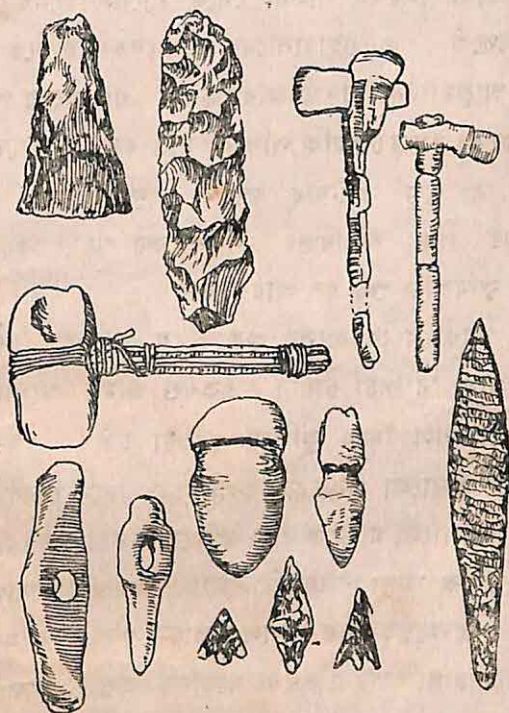
নব্যপ্রস্তর যুগের অস্ত্রশস্ত্র

ইত্যাদি আলাদা আলাদা কাজের জন্য পাথরের নানান সাজ-সরঞ্জাম তৈরি করে নিচ্ছে এ যুগের মানুষ। আস্ত পাথরের গায়ে এক বিশেষ কায়দায় আঘাত করে লম্বাটে পাতলা ধরনের ফলক খসিয়ে এনে তা' দিয়ে তৈরি হচ্ছে হাতিয়ার। এই ফলক-পাথরের হাতিয়ার পূর্বযুগের পরত-পাথরের হাতিয়ার অপেক্ষা অনেক উন্নত ধরনের ছিল।

দ্বিতীয় পাঠ ঃ উৎপাদক মানব সমাজ

পুরানো পাথরের যুগের হাতিয়ারে শুধু নয়, জীবন যাপন পদ্ধতির

মধ্যেও রূপান্তর আসে এ যুগে। বিশেষ কয়েকটি দিকে এই রূপান্তর বিপুল সম্ভাবনার সৃষ্টি করে। এজন্য এ অবস্থাকে একটা উচ্চতর স্তরে আরোহণ বলা যায়।

এই আরোহণ-পর্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য দু'টি—কৃষি ও পশুপালন। কৃষিকাজের প্রথম নিদর্শন পাওয়া গেছে প্যালেস্টাইনের ওয়াদি-এল-নাটুফ গুহা থেকে। এ গুহাবাসীদের নাম দেওয়া হয়েছে 'নাটুফীয়'। এদের বয়স আনুমানিক সাত হাজার বছর। এই গুহায় পাওয়া গেছে হরিণের পাঁজরের হাড়ে চকমকি পাথরের দাঁত বসানো কাস্তে। এগুলো লাগত ঘাস বা খড় কাটবার জন্য। অনুমান করা হয় যে এই 'নাটুফীয়'-রাই প্রথম অল্পবিস্তর কৃষিকাজের সূচনা করে। অবশ্য ব্যাপকভাবে কৃষিকাজ শুরু হয় আরও পরে।

ব্যাপক আকারে চাষবাসের শুরুতে যে প্রক্রিয়ায় চাষ করা হত তাকে বলা যায় 'বাগিচা চাষ'। একখণ্ড জমির আগাছা পরিষ্কার করে মাটি কোদাল দিয়ে কুপিয়ে নেওয়া হত। একখণ্ড কাঠের হাতলের সঙ্গে ধারালো পাথরের ফলা লতা দিয়ে বেঁধে তৈরি হত কোদাল। কোপানো মাটিতে বীজ ছড়িয়ে দেওয়া হত। বীজ থেকে অঙ্কুর, অঙ্কুর থেকে ফসল। একটি এলাকায় সমস্ত চাষযোগ্য জমিতেই এভাবে পর পর কয়েক বছর ফসল ফলানো হত। জমির উৎপাদন ক্ষমতা যখন আর থাকত না তখন সাময়িক বসতি তুলে দিয়ে নতুন কৃষি এলাকার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ত এই সব কৃষিজীবী মানুষেরা। গড়ে উঠত নতুন আর এক বসতি। পশ্চিম এশিয়ার নানা জায়গায় এভাবেই আদিম কৃষি-নির্ভর জনসমাজ গড়ে উঠেছিল।

অবশ্য এমন এলাকাও ছিল—যেমন নীলনদের উপত্যকা অঞ্চল—যেখানে জমি বাতিল করার প্রয়োজন হত না। নদীবাহিত পলিমাটি প্লাবিত এলাকার উর্বরতা পুরোপুরি বজায় রাখে—বন্যাপ্রবণ এলাকার মাটির এই বৈশিষ্ট্য মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এই এলাকাগুলিতে এ কারণেই গড়ে উঠেছিল সমৃদ্ধ নদীমাতৃক সভ্যতা।

তৃতীয় পর্ব ।। প্রথম বিপ্লব

প্রথম পাঠঃ পশুপালন

পুরানো পাথরের যুগের শেষদিকেই মানুষের আস্তানায় কুকুরের হাড় পাওয়া গেছে। কম হিংস্র জানোয়ার মানুষের হাতে প্রায়ই জীবন্ত ধরা পড়ত। আস্তানায় এনে সেটা বেঁধে রাখা হত—উদ্দেশ্য, পরে এক সময় খাদ্য হিসাবে সেটির সদ্ব্যবহার করা। বাঁধা অবস্থায় তাদের হাবভাব লক্ষ্য করে কয়েকটি মূল্যবান তথ্য পাওয়া গেল। দিনের পর দিন গোরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি পশুগুলি দুধ দিতে পারে যা কিনা বেশ উপাদেয় পানীয়। পরন্তু বছরের পর বছর বাচ্চা দিয়ে এরা সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে। এই অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ পশু-পালন আরম্ভ করে। শুরু হয় রাখালিয়া জীবন-ধারা।

দ্বিতীয় পাঠঃ আচ্ছাদন, আস্তানা, মাটির কাজ, যানবাহন

কৃষি ও পশুপালনের কৌশল আয়ত্তে আসার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রার বৈপ্লবিক পরিবর্তন শুরু হল। খাদ্যের সন্ধানে এদিক ওদিক ছুটে-বেড়ানো যাযাবর মানুষ খাদ্যের যোগানের বিষয়ে কিছুটা নিশ্চিত হবার পর তার অন্যান্য প্রয়োজনগুলো আরো সুষ্ঠুভাবে মেটাবার দিকে নজর দিল। বহুমুখী তৎপরতার শুরু এখান থেকেই। এতদিন পর্যন্ত মানুষ পাতার বা চামড়ার তৈরি পোশাক ব্যবহার করেছে। মিশর ও পশ্চিম এশিয়ায় নতুন পাথর-যুগের গ্রাম জীবনের নিদর্শনের মধ্যে বয়ন-শিল্পের সাক্ষ্য আছে। অবশ্য বয়ন-কৌশল আয়ত্ত করবার জন্য মানুষকে অনেকগুলো আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে এগোতে হয়েছে। প্রথমেই শন, তুলা, পশম ইত্যাদি তন্তু জাতীয় পদার্থের গুণাগুণ জানতে হয়েছে। তারপর চুবড়ি বোনার কারিগরি কৌশলকে আরো সূক্ষ্মভাবে প্রয়োগ করে গড়তে হয়েছে তাঁত। এই তাঁতের

আবিষ্কার মানুষের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ও প্রয়োগ-কৌশলের এক বিস্ময়কর নিদর্শন।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে আমরা জেনেছি যে কৃষিজীবী মানুষ মাত্রেই পোড়ামাটির পাত্র ব্যবহার করেছে। পোড়া মাটির পাত্র গড়তেও প্রয়োজন যথেষ্ট কারিগরি জ্ঞান ও নৈপুণ্যের। পাত্রের জন্য চাই বিশেষ ধরণের মাটি আর বিশেষ মাত্রার উত্তাপ। কলসী তৈরির কৌশল ছিল আরো জটিল—নানান মাপের কতকগুলি মাটির আংটাকে আধাশুকানো অবস্থায় নেওয়া হ'ত। বিভিন্ন রঙের মাটি দিয়ে পাত্রের
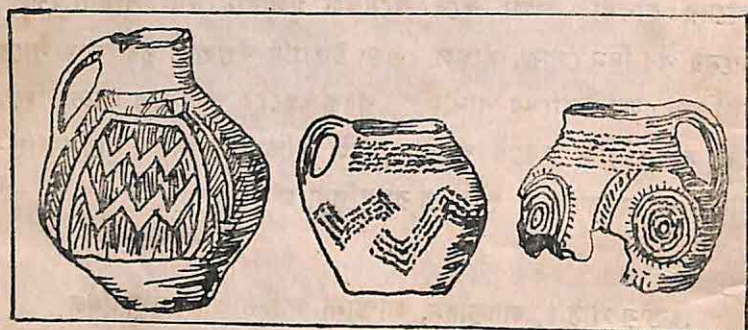
মাটির পাত্র (মহেঞ্জোদারো)

অলংকরণের পদ্ধতিও জানা ছিল এ যুগের মানুষের। পোড়ামাটির পাত্রের ব্যবহার প্রথম শুরু হয়েছিল পশ্চিম এশিয়ায়—পরে এ যুগের অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মধ্যেও এর ব্যবহার ছড়িয়ে পড়েছিল।

চাষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ স্থায়ী বাসস্থান গড়বার উদ্যোগ নেয়—বিশেষ করে পলি-সমৃদ্ধ এলাকায়। আগের যুগের শেষ দিকেই গুহা আর গর্তের আস্তানা ছেড়ে মানুষ কাঠের গুঁড়ি সাজিয়ে কুটির গড়তে আরম্ভ করেছে। পরের ধাপে এসেছে নলখাগড়ার বেড়া দেওয়া ছাউনি, আরো পরে সম্পূর্ণ মাটির বেড়ার ঘর এবং শেষে রোদে শুকানো ইটের দালান। এই সর্বশেষ পর্যায় থেকেই মানুষের স্থাপত্য বিদ্যার শুরু।

ছয় সাত হাজার বছর আগে যাত্রিবাহী বা মালবাহী গাড়ি টানার জন্য চাকার চলন শুরু হয়েছিল। আধুনিক যন্ত্রযুগের সূত্রপাত এই

চাকা থেকেই। তখন চাকা তৈরি হত তিন টুকরো কাঠ দিয়ে। এই চাকার আবিষ্কার আর তার যান্ত্রিক ব্যবহার মানুষের সামনে সমৃদ্ধির এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল।

তৃতীয় পাঠ : গোষ্ঠীজীবন, সংস্কার ও শিল্প

নতুন পাথর যুগে মানুষের সমস্ত ধ্যান-ধারণা ও কর্মতৎপরতারও কেন্দ্রে ছিল গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন। বাঁচার প্রবল তাগিদ মানুষকে একজোট করেছিল। এই একত্রে চলার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল যুগোপযোগী কিছু কিছু আচার, অভ্যাস ও মতাদর্শ। এই আচার-অভ্যাস আর মতাদর্শের মূলে ছিল অন্ধ বিশ্বাস যা আবার আজকের বিচারে কুসংস্কারের সামিল। প্রতিকূল প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে মানুষ ভয় করত কারণ সেগুলির সামনে মানুষ ছিল নিতান্তই অসহায়। অপরদিকে অনুকূল প্রাকৃতিক শক্তি ও পরিবেশকে তারা স্বাগত

গুহাচিত্র (বাইসন)

জানাতো সমবেতভাবে। পুরানো পাথর-যুগ থেকেই মানুষ তাদের এই মনোভাবটি ফুটিয়ে তুলত গুহাচিত্রে ও সমবেত নাচ-গানের মধ্য দিয়ে।

বিবর্তনের ধারায় নতুন পাথর-যুগের মানুষের জীবনযাত্রায় কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে ঠিকই, কিন্তু নিশ্চিত নিরাপদ জীবন তখনও অনেক দূর। কয়েক বছর ভাল ফসলের পর একবার এল অজন্মা। গ্রামকে গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল প্রকৃতির সামান্য ভ্রূকুটিতেই। উদ্বৃত্ত অঞ্চল থেকে খাদ্যশস্য এনে অভাব মেটাবার মত সংগঠন তখনও গড়ে ওঠেনি। তাই প্রকৃতির আশীর্বাদের ওপর তাদের পুরোপুরি নির্ভর করতে হত। এই আশীর্বাদ অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ, উপাসনা, শাসানি ইত্যাদি সবরকম কৌশলের আশ্রয় নিত তারা। তারা বিশ্বাস করত অদৃশ্য কোন এক মহাশক্তি—ধরা যাক পরমাত্মা—তারই ইঙ্গিতে মানুষের জীবনে ভালও হয় আবার মন্দও হয়। যে বাইসনটিকে শিকার করা হ'ল ঐ পরমাত্মার ইঙ্গিতেই বাইসনের আত্মা সদয় হয়ে শিকারীর নাগালের মধ্যে এনে দিল তার দেহটিকে। খুশি করতে হবে পরমাত্মাকে, খুশি রাখতে হবে বাইসনের আত্মাকেও, বাইসনের দেহ তার খাদ্য, সুতরাং বাইসন তার অন্নদাতা। এই অন্নদাতাকে খুশি রাখবার জন্য সে নিজেকে বাইসানের বংশধর বলে ঘোষণা করতেও রাজি। জন্তু-জানোয়ারের নামে বংশ পরিচয় শুরু হয় এভাবেই। একে বলে টোটেম-বিশ্বাস। এই টোটেম-বিশ্বাস বা সংস্কারই ছিল নতুন প্রস্তর যুগের সামাজিক সংগঠনের ভিত্তি।

এযুগে সর্দার বা মোড়ল স্থানীয় কেউ সম্ভবত ছিল না। অভিজ্ঞ বয়োজ্যেষ্ঠরা সমাজকে পরিচালিত করত। পুরানো প্রস্তর যুগের কায়দাতেই কবর দিয়ে মৃতের সৎকার করা হত। এই সৎকারের সময় বিশেষ ধরনের আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হত। কবর দেওয়া হ'ত আস্তানার কাছাকাছি। কবরের মধ্যে দেওয়া হত খাদ্য, হাতিয়ার আর পাত্র।

চতুর্থ পাঠ : ভাষা ও উপাসনা

বাঁচার তাগিদে মানুষ দশ হাত এক করেছে—দল বেঁধেছে। দশজনে একত্রে কাজ করতে গেলে দরকার বোঝাপড়ার—একজনের

চিন্তার সঙ্গে অপর সকলের চিন্তাকে মেলানোর—এককথায় ভাব বিনিময়ের। গোড়াতে এই ভাব-বিনিময় হত গলা দিয়ে কিছু বোবা আওয়াজ ও অঙ্গভঙ্গির দ্বারা। জিভ আর মগজের সুষ্ঠু বোঝাপড়া তখনও তৈরী হয়নি। সমাজ-জীবনের জটিলতা বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় নানান ধরনের কাজ আর নানান ধরনের হাতিয়ারের ব্যবহার। ফলে পুরানো কায়দায় ভাব বিনিময় আর চলল না। এজন্য ভোঁতা বোবা আওয়াজকেও নানান ধরনের সাংকেতিক আওয়াজে ভেঙ্গে চুরে ঠিক করে নিতে হ'ল—ঠিক যেমন পাথরের হাতিয়ারকে ঘষে মেজে নানান আকৃতি দিয়ে নানান কাজের উপযোগী করে নেওয়া হ'ত।

এইভাবে ধীরে ধীরে এল ভাষা। ভাষা তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তার মধ্যে এল শৃঙ্খলা—সুশৃঙ্খল চিন্তার মধ্য দিয়ে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যে সমস্ত কলা-কৌশল মানুষকে 'মানুষ' করে তুলেছে তার কোনটাই মানুষের কাছে বিশেষ দান হিসাবে আসেনি। সবই মানুষ বুদ্ধি ও চর্চার দ্বারা অর্জন করেছে।

আগেই আলোচনা করেছি, মানুষের সমস্ত ধ্যান ধারণা জুড়ে রয়েছে আরও বেশী শিকার আর বেশী ফসল। টোটেম-ধারণা হয়ত বা শিকার মিলিয়ে দিল কিন্তু পর্যাপ্ত ফসল পাওয়া যাবে কি করে? মৃত্তিকা-মাতার উপাসনা করতে হবে। মাটিকে মা হিসাবে আর ফসলকে সন্তান হিসাবে কল্পনা করতে হবে। মাটি-মাতার প্রতীক হিসাবে নারীমূর্তি গড়ে নিয়ে এক বিশেষ ধরণের অনুষ্ঠান পালন করতে হবে।

'শস্য রাজা'র পূজাও এই ধরণের আর একটি অনুষ্ঠান। একবছরের জন্য একজনকে শস্য রাজা করে 'রাণী'র সঙ্গে তার বিয়ে দিতে হবে। এর ফলে মাটি সুজলা-সুফলা হয়ে উঠবে। পরে সেই 'শস্য-রাজা'কে হত্যা করে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পাঠ ঃ নগর সভ্যতার সূচনা

নতুন প্রস্তর যুগের শেষদিকে পাথরের কোদাল দিয়ে নয় পাথরেয় ফলা-লাগানো লাঙ্গল দিয়ে পুরোপুরি কৃষিকাজ শুরু করে দিয়েছে মানুষ। মাটি ওলট পালট করে চাষ আবাদ শুরু হওয়ায় ফসলের উৎপাদন বেড়ে গেছে অনেক। ফলে উদ্বৃত্ত ফসল জমছে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে। খাদ্য উৎপাদনের কাজে সবাইকে হাত লাগাতে হবে —দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এই নিয়মটির কড়াকড়ি শিথিল করে দেওয়া চলতে পারে। সমৃদ্ধ হয়ে ওঠা প্রত্যেক গোষ্ঠীই এখন কিছু লোককে অন্য ধরনের কাজের বদলে খাদ্য যোগাতে পারে। মৃৎশিল্প, দারুশিল্প, বয়ন-শিল্প ইত্যাদি বিভিন্ন শিল্পগুলি এতকাল চলছিল ঘরোয়াভাবে। এখন এই সমস্ত শিল্প-উদ্যোগে পুরো সময়ের জন্য লোক নিয়োগ করা হল —সমাজ তাদের খাদ্য-সংস্থানের দায়িত্ব নিল। ইতিমধ্যে ধাতুর আবিষ্কার ও ব্যবহার শুরু হয়েছে। আকর থেকে ধাতু নিষ্কাশন করা এবং সেই ধাতুকে ছাঁচে ফেলে তার থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈরী করতেও দরকার হল বিপুলসংখ্যক পুরো-সময়ের কর্মীর দলবদ্ধ চেষ্টা। পলি এলাকায় ধাতুর আকর পাওয়া যায় না। তাই আকর সংগ্রহ করা এবং উদ্বৃত্ত ফসলের একটা চলনসই বিলিবন্দোবস্ত করবার জন্য আরও একদল পুরোসময়ের কর্মী দরকার হ'ল। ওদিকে বিবর্তনের পথ বেয়ে গৃহ-নির্মাণ শিল্পও পরিণত হয়ে উঠছে। পোড়া ইটের ইচ্ছামত গড়ন দেওয়া বড় বড় দালান তেরী হচ্ছে। এখানেও ডাক পড়ছে অনেক কর্মীর, সব মিলিয়ে মানুষের জীবন যাত্রার ধরনে বড় আকারের ওলট পালট ঘটে যাচ্ছে— আত্মনির্ভর গ্রামের কাঠামো ভেঙ্গে পড়ছে—গড়ে উঠছে শিল্প ও বাণিজ্য-নির্ভর ব্যাপকতর একটি সমাজ-কাঠামো—যাকে বলা যেতে পারে নগর-সভ্যতার কাঠামো। আলাদা আলাদা নানান কাজে ব্যস্ত

মানুষের সমাগমে মুখর হয়ে উঠছে জনসমাজ। নগর-সভ্যতা এই নামের মধ্যেই নতুন গড়ে-ওঠা এই সমস্ত জনগোষ্ঠীর যে সমাজ-কাঠামো তার রূপটাকে চেনা যাচ্ছে। এগুলো শিল্প ও বাণিজ্যের মজবুত ভিতের উপর অগণিত মানুষের মেহনত দিয়ে গড়ে-তোলা বড়-সড় মাপের নগর।

দ্বিতীয় পাঠ ঃ সামাজিক রূপান্তর, শ্রেণীবিভাগ

পূর্বের আলোচনাতে আমরা জেনেছি যে নগর সভ্যতার সবচেয়ে বড় শর্ত হচ্ছে এই যে বিপুল সংখ্যক মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কাজের বিনিময়ে খাওয়াবার মত বিপুল পরিমাণ উদ্বৃত্ত শস্যের যোগান। এই উদ্বৃত্ত শস্যের মজুত ভাণ্ডারকে বলা যেতে পারে পুঁজি। সুতরাং নগর-সভ্যতা গড়ার আগে মানুষকে পুঁজি তৈরি ক'রে নিতে হয়েছে। এই পুঁজি সে কিভাবে তৈরি করেছে? অধিকাংশ পুরাবিদের মতে এটা তৈরি হয়েছে জবরদস্তি লুটপাটের মধ্য দিয়ে।

পলি এলাকার চাষীরা নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়েও কিছু উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য মজুত করতে পারত। আরো বেশি মেহনত করলে মজুত আরো বাড়ানো যেত—কিন্তু বেশি মেহনতের জন্য তাঁদের ওপর কোন চাপ ছিল না। এক সময় চাপ এল যখন শিকারী যাযাবর গোষ্ঠীর লোকেরা চাষী গ্রামগুলোর উপর চড়াও হ'ল এবং রক্তাক্ত সংঘাতের মধ্য দিয়ে দখল করে নিল মজুত ভাণ্ডারগুলো আর আত্মসমর্পণে বাধ্য করল চাষীদের। এরপর সাধ্য মত চাষ আর বেশী বেশী ফসলের ভাগের জন্য চাপ পড়ল বিজিত চাষীদের উপর। পেট চলুক আর নাই চলুক বিজেতাদের প্রাপ্য অংশ মিটিয়ে দিতেই হবে। এভাবেই একদল মানুষকে জবরদস্তি করে খাটিয়ে আর এক দল মানুষ জমাতে থাকে পুঁজি। পুঁজি মজুত করার অধ্যায়ের শুরু এখান থেকেই। এই পুঁজি অর্থাৎ জমানো শস্যের বিনিময়ে গড়ে উঠল শিল্প আর বাণিজ্য—তৈরি হ'ল নগরের ভিত।

এতদিন মানুষ জানোয়ারকে পোষ মানিয়েছে—নিজেদের নানান প্রয়োজনে ব্যবহার করেছে। এবার মানুষ শিখল যুদ্ধে যারা পরাজিত হয় তাদের হত্যা না করে তাদের দিয়ে দাসত্ব করালে লাভ অনেক। কিছুসংখ্যক মানুষের কাছে বেশীসংখ্যক মানুষের দাসত্বের শুরু এই সমস্ত বাস্তব তাগিদ আর নিষ্ঠুর হিসাববোধ থেকেই। একজন মানুষকে হত্যা না করে বাঁচিয়ে রাখা হল, যতটুকু না হলে নয় ততটুকু খাদ্য দেওয়া হল তাকে তার জীবনধারণের জন্য। তার পরিশ্রম থেকে পাওয়া সমস্ত সম্পদই প্রভু শ্রেণীর লোকেরা দখল করে নিল। সে হ'ল মালিকের উৎপাদনের সজীব হাতিয়ার—এই হ'ল দাসত্বের বাস্তব চিত্র।

তাই দেখা গেল নগর সভ্যতার সূচনাতেই মানুষের আদিম সাম্য সমাজের কাঠামোটি গেল ভেঙ্গে। এল দু'টি শ্রেণী—একটি প্রভু, অপরটি দাস, একটি শোষক, অপরটি শোষিত। মানুষের সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটল। এতদিন চাষযোগ্য জমি ও গৃহপালিত পশু ছিল গোষ্ঠীর সম্পদ। সে সবের উপর এবার প্রভুদের মালিকানা কায়েম হল—গোষ্ঠী-মালিকানা ভেঙ্গে গিয়ে এল ব্যক্তি-মালিকানা।

সাবেক আমলের সমাজ-কাঠামোর মধ্যে এই যে মৌলিক পরিবর্তনগুলো ঘটে গেল তা যাতে বজায় থাকে—এবার নজর দেওয়া হ'ল সেদিকে। জনসাধারণের উপর খবরদারি চালাবার একটি পাকাপোক্ত ব্যবস্থাপনা চাই। এই রকম দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই গড়ে উঠল প্রাথমিক ধরনের রাষ্ট্রযন্ত্র। এই রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকল জবরদস্ত শাসক, থাকল সৈন্যসামন্ত আর থাকল নিয়মভঙ্গকারীদের শাস্তির বিধান।

তৃতীয় পাঠ : নদীমাতৃক সভ্যতার বিকাশ

পাকাপোক্তভাবে কৃষিকাজ শুরু করার পর মানুষ স্থায়ী বসতি গড়ার দিকে নজর দিয়েছে। স্থায়িভাবে বাসস্থান গড়বার জন্য মানুষ

নদী উপত্যকাগুলি বেছে নিয়েছে অনেকগুলি সুবিধার কথা মনে রেখেই। নদীবাহিত পলিতে অল্প শ্রমে প্রচুর ফসলের উৎপাদন সম্ভব —এটা সবচেয়ে বড় সুবিধা। তাছাড়াও আছে সারা বছর যথেষ্ট পরিমাণ পানীয় জল পাওয়ার নিশ্চয়তা। নদীতীরে গজিয়ে ওঠা বুনো ঘাসের জঙ্গল পশু খাদ্যের চাহিদা মিটাতে পারে। নদীর মাটি দিয়ে তৈরী হচ্ছে ইঁট যা রোদে শুকিয়ে নিয়ে গড়ে তোলা হচ্ছে নানান ধরণের বাসস্থান। ইতিমধ্যে নৌকার পাল আবিষ্কার হওয়ায় বড় বড় নৌকায় উদ্বৃত্ত পণ্যসম্ভার চাপিয়ে দূর দেশে পাড়ি জমানো যাচ্ছে এই নদীপথ ধরে। এসব সুবিধার দিকে নজর রেখে নতুন প্রস্তর যুগেই মানুষ নদীর ধারে ধারে গড়ে তুলেছিল তাদের গ্রামগুলি। পরে এই গ্রামগুলিকে কেন্দ্র করেই নগর-সভ্যতার কাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে।

অবশ্য নদী উপত্যকাকে চাষযোগ্য ও বাসযোগ্য করে তোলার কাজটা সহজ ছিল না। গোড়ার দিকে দু'এক টুকরো অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার জমি বাছাই করে নিয়ে চাষ করায় বিশেষ মেহনত লাগেনি। কিন্তু চাষের এলাকা ও বাসের এলাকা বাড়াতে গিয়ে অনেক জলাভূমির জল সেচতে হয়েছে, নলখাগড়ার নিবিড় জঙ্গল পরিষ্কার করতে হয়েছে। একাজ করেছে আশেপাশের অনেকগুলি গ্রামের সমস্ত মানুষ একজোট হয়ে। এতখানি মেহনতের মধ্য দিয়ে যে ভূভাগ উদ্ধার করা হয়েছে সেই ভূভাগ তাদের কাছে হয়ে উঠেছে অতি পবিত্র। কোন অবস্থাতেই এই সব এলাকা পরিত্যাগ করার কথা তারা ভাবতে পারে না।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পর্ব ।। মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা

প্রথম পাঠ : অবস্থান ও প্রাচীনত্ব

নগর সভ্যতার প্রথম ও অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল মেসোপটেমিয়া —যার বর্তমান নাম ইরাক। গ্রীকদের দেওয়া মেসোপটেমিয়া নামের অর্থ দুই নদীর মধ্যবর্তী দেশ। এই দেশটির উত্তরাংশের নাম ছিল

মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা

আসিরিয়া আর দক্ষিণাংশের নাম ছিল ব্যাবিলোনিয়া। ব্যাবিলোনিয়ার উত্তরাংশের নাম আক্কাদ আর দক্ষিণাংশের নাম সুমের। নদী দুটির নাম টাইগ্রিস আর ইউফ্রেটিস।
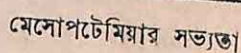
এই অঞ্চলে অনেকগুলো ঢিবির সন্ধান পাওয়া গেছে যেগুলি খুঁড়ে উদ্ধার করা হয়েছে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অনেক নিদর্শন। এই সমস্ত ঢিবির একেবারে গোড়ার স্তরে দেখা যায় নতুন প্রস্তর যুগের কৃষি-নির্ভর গ্রাম। এই গ্রামের কাঠামোর সর্বশেষ স্তর অতিক্রম করেই এসে পড়তে হয় জমজমাট নগর-সভ্যতার স্তরে। এই স্তরের বয়স কমপক্ষে পাঁচ হাজার বছর। এখানে আমরা যে জীবনযাত্রার চিত্র পাই আধুনিক নাগরিক জীবনের সঙ্গে তার মিল আছে অনেক।

এই অঞ্চলে যে নগর-সভ্যতা গড়ে ওঠে সেটি সম্ভবত পৃথিবীর প্রথম সভ্যতা এবং এই সভ্যতার স্রষ্টা ছিল সুমেরীয়ানরা।

সুমের আর আক্কাদ অঞ্চলে নগরের সংখ্যা ছিল গোটা কুড়ি। নগরগুলির মধ্যে মাঝে মাঝে যুদ্ধ বিগ্রহ হয়েছে—বিজয়ী দল বিজিত মানুষদের পদানত করেছে। কিন্তু গোটা অঞ্চল জুড়ে ভাষা, ধর্ম বা জীবনযাপন পদ্ধতির মধ্যে পরিবর্তন যা কিছু হয়েছে সবই হয়েছে সমানভাবে ও সমানতালে। যুদ্ধ এই জীবনযাপন পদ্ধতির মধ্য কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। এর কারণ অবশ্য এটাই যে সুমেরীয়ানরাই সুমেরীয়ানদের সঙ্গে লড়াই করেছে এবং পদানত করেছে।

দ্বিতীয় পাঠ ঃ শস্য ও সেচ

আমরা আগে আলোচনা করেছি নগর সভ্যতার পটভূমি গড়বার জন্য চাই বিপুল পরিমাণ মজুত শস্য যাকে রূপান্তরিত করা যাবে পুঁজিতে। কৃষির সঙ্গে যুক্ত নয় অথচ নাগরিক জীবনের নানান গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত আছে এমন অগণিত মানুষের খাদ্যের সংস্থান করে দিতে হবে গোষ্ঠিকে।

টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিসের বন্যায় এই অঞ্চলের জমি এমনিতেই উর্বর। তার উপর যদি কৃষকদের বাধ্য করা যায় অধিক মেহনত দিতে তবে ফসলের মজুত ক্রমাগত বাড়িয়ে তোলা যায়। করা হয়েছিলও তাই। ফলে এই নগরগুলিতে আমরা দেখতে পাই বৃহদায়তন শস্য ভাণ্ডারের। এই শস্য ভাণ্ডারের মালিক ছিলেন নগর-দেবতা স্বয়ং। তাঁর হয়ে ভাণ্ডারীর কাজ করত দেব-মন্দিরের পুরোহিতরা। কৃষকদের প্রয়োজন হলে পুরোহিতরা তাদের বীজধান আর লাঙ্গল টানার পশু আগাম দিত। শোধ নেওয়ার সময় প্রাপ্যের উপর সুদ দাবি করত। নদী থেকে খাল কেটে কেটে সেচের জলের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। পানীয় জল সংগ্রহ করা হত এই খাল থেকেই, এই খাল দিয়ে পণ্যবাহী নৌকাও চলাচল করত।

অবশ্য কৃষকদের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। উৎপন্ন ফসলের বেশির ভাগটাই তুলে দিতে হত দেবতার ভাণ্ডারে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে জমির উপর চাপ ক্রমাগত বাড়ে অথচ জমির পরিমাণ বাড়ে না, নগর-প্রভুদের আয়ও বাড়ে না। তখন নজর পড়ে আশে-পাশের চাষের জমির দিকে। শুরু হয় জমির দখল করার জন্য আর দখলে রাখার জন্য তুমুল লড়াই।

তৃতীয় পাঠঃ অন্যান্য বৃত্তি

কৃষক ছাড়া অন্যান্য যেসব বৃত্তিজীবীর দেখা পাওয়া যায় এই নগরগুলিতে তারা হল পুরোহিত, সর্দার, বণিক, হিসাবরক্ষক, ধাতু-কারিগর, মৃৎশিল্পী, ছুতোর, রাজমিস্ত্রী, সৈনিক, মনিকার ইত্যাদি।

নতুন পাথর যুগে যারা ছিল বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের পুরোহিত, সভ্যতার এই নতুন স্তরে এসে তারাই হয়েছে নগর-দেবতার পুরোহিত। নগর-দেবতার সমস্ত সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক তারাই, দেবতার ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রচারকও তারা। সাধারণ মানুষ পুরোহিতের নির্দেশ মেনে চলে। সমস্ত নগর রাজ্যগুলি পরিচালনা করে এই পুরোহিতরাই।

এই সময় এমন সব উপকরণের ব্যবহার শুরু হয়েছে যেগুলোর বেশীর ভাগই পলি এলাকায় দুষ্প্রাপ্য। নিয়মিত এবং ব্যাপক বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে আশেপাশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তা সংগ্রহ করে আনার জন্য গড়ে উঠেছে বণিক সম্প্রদায়। এরা একদিকে যেমন আনছে কাঁচামাল সংগ্রহ করে, অপরদিকে তেমনি উদ্বৃত্ত শিল্পজাত পণ্য নগরের বাজারে পৌঁছে দিচ্ছে। উন্নত শিল্প-কাঠামো না থাকলে এতটা করা সম্ভব হ'ত না। সুতরাং সিদ্ধান্ত করা চলে যে এদের কারিগরি দক্ষতাও ছিল উল্লেখযোগ্য। সুমেরের কামারশালায় তামা আর টিন মিশিয়ে (ব্রোঞ্জ) ঢালাই-এর কাজ হত ভারি সুন্দর। কৃষকদের মত এই কারিগররাও ছিল দাস শ্রেণীভুক্ত। এই কারিগরদের শিল্পের কাঁচামাল আগাম যোগান দেওয়া হত। অন্যান্য পেশাজীবীদের কাজের বোঝাও

কম ছিল না। স্বাধীন নগরগুলির মধ্যে জমি আর জলের দখল নিয়ে যুদ্ধ বিবাদ লেগে থাকত বলে যোদ্ধাদের গুরুত্বও যথেষ্ট ছিল। সুমেরিয়ান যোদ্ধারা ঢাল ও বর্শা নিয়ে খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করত।

চতুর্থ পাঠ : সুমেরীয়ানদের কৃতিত্ব

সুমের অঞ্চলের ঢিবিগুলিতে খনন-কার্য চালিয়ে আমরা অতি উন্নত এক নাগরিক-সভ্যতার সন্ধান পাই। নগর দেবতার মন্দিরের নাম 'জিগগুরাট'। মাটির পিণ্ড দিয়ে তৈরী পাহাড়ের চূড়ায় মন্দির গড়ে তোলা হয়েছিল কাদামাটির ইট দিয়ে। এই কৃত্রিম পাহাড়ের আশেপাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ছিল মস্ত মস্ত দেব দেউল। মন্দিরগুলি গড়তে দরকার হয়েছিল ভাল ভাল মাটি, অসংখ্য ইট আর পোড়ামাটির পাত্রের। পাহাড়ের গা দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হত সাদা, কালো আর লাল রং এর খুড়ি—ফুটিয়ে তোলা হ'ত সুন্দর মোজাইক-নক্সা। মন্দিরের ভেতরের দেওয়ালে দেখা যায় জন্তু-জানোয়ারের মূর্তি—প্রথমদিকে কাদামাটির তৈরি, পরে তৈরি রং বেরং-এর ঝিনুক দিয়ে। আর পাওয়া যায় নানান চিত্রমালা যার মধ্য দিয়ে ফুটে ওটে নাগারিকদের বহুমুখী তৎপরতার পরিচয়। এখানে আমরা এমন একদল ভাস্করের পরিচয় পাই যারা চুনাপাথর আর ব্যাসল্ট পাথরে মুর্তি খোদাই করতে পারত। দারু শিল্পীরা কাঠ দিয়ে রথ, নৌকা এবং বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্র তৈরি করত। এখানকার কারিগররা নিজেদের কাজে ছিল খুবই দক্ষ। তামা আর টিন মেশানো ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি হ'ত নানা বিচিত্র শিল্পপণ্য ও হাতিয়ার। এই সুমেরীয়ান কারিগররা তৈরী করতে জানত স্বচ্ছ কাচের ব্যবহার্য সামগ্রী।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে কারিগররা যেসব শিল্প সম্ভার তৈরী করত তার কাঁচামাল প্রায় সবটাই আশেপাশের নানান দেশ থেকে সংগ্রহ করে আনতে হত। তামা, টিন, কাঠ, পাথর সোনা, রূপো, সীসে—সমস্তই

স্থলপথে বা জলপথে বিভিন্ন খনি অঞ্চল বা নীলনদ ও সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রস্থল সিন্ধুনদের তীরবর্তী নগরগুলি থেকে নিয়মিত লেনদেনের মাধ্যমে পাওয়া যেত। এই বাণিজ্য পথগুলি তাদের বাণিজ্য-বহরের জন্য নিরাপদ রাখাটাও ছিল একটা সমস্যা। প্রলোভন অথবা বলপ্রয়োগের দ্বারা সুমেরীয়ানরা অন্য জনগোষ্ঠীর সহযোগিতা আদায় করে নিত। আবার এই নিয়মিত বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে প্রায়ই গড়ে উঠত সামাজিক যোগাযোগ—এর ফলে এক অঞ্চলের শিল্প ও আবিষ্কার দ্রুত ছড়িয়ে পড়ত অন্যান্য অঞ্চলেও।

জিগগুরাটের মধ্যে পাওয়া যায় বিশেষ ধরণের পোড়ামাটির ফলক, যার গায়ে ছিল অনেকগুলো সাংকেতিক ফুটো আর তার পাশে কিছু সাংকেতিক চিহ্ন। অনুমান করা যায় এই ফুটোগুলো নির্দেশ করত

কিউনিফর্ম লিপি (তীরমুখো লেখা)

সংখ্যা—পরবর্তীকালের গণনা পদ্ধতির শুরু এভাবেই। আর ঐ সাংকেতিক চিহ্ন থেকে শুরু হয়েছিল লেখা ও লিপির। ফলকগুলোতে লেখা থাকত মন্দিরের ধন-সম্পদের হিসাব। পরে ধীরে ধীরে এই ফলক-লিপিকে আরও উন্নত করা হয়েছিল। কাদামাটির গায়ে কীলকাকৃতি হরফগুলিকে ফুটিয়ে তুলে আগুনে পুড়িয়ে নেওয়া হত। এই সাংকেতিক চিহ্ন বা হরফগুলি প্রথমদিকে ছিল ভাবপ্রকাশক—প্রায় ছবির ধরণের। পরে এই চিহ্নগুলিকে শব্দ প্রকাশক হিসাবে তৈরী করে নেওয়া হয় আর এদের আকারও অনেক সংক্ষিপ্ত করা হয়। এই লিপির নাম দেওয়া হয়েছে কিউনিফর্ম লিপি।

দ্বিতীয় পর্ব ॥ মিশরীয় সভ্যতা

প্রথম পাঠ : অবস্থান

মিশর দেশটির দু'দিকে সমুদ্র আর দু'দিকে মরুভূমি—উত্তরে ভূমধ্যসাগর, পূর্বে লোহিত সাগর, পশ্চিমে লিবিয়ার মরুভূমি আর দক্ষিণে নিউবিয়ার মরুভূমি। দেশটির আয়তন দশ হাজার

মিশরীয় সভ্যতা

বর্গমাইল। দেশটির মাঝ দিয়ে বয়ে গেছে নীলনদ—এই নদীটিই মরুভূমির গ্রাস থেকে রক্ষা করেছে দেশটিকে। প্রতি বছরে এই নদীর বন্যা মিশরের মাটিকে উর্বর করে তোলে। এই একটি মাত্র নদীর ওপর নির্ভর করে থাকে গোটা দেশ।

উত্তর মিশর আর দক্ষিণ মিশর—দু'টি প্রায় আলাদা প্রদেশ। এই দু'টি অঞ্চলের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকলেও পরস্পর নির্ভরশীলতার জন্যই এদের মিলতে হয়েছিল—গড়তে হয়েছিল একটি দেশ। একটি অবিচ্ছিন্নতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নীলনদের বড় ভূমিকা ছিল। বাইরের শত্রুর আক্রমণের মুখে মেসোপটেমিয়া যেমন ছিল অনেকখানি উন্মুক্ত, মিশর তেমন ছিল না। মরুভূমি আর সমুদ্র এই দেশটিকে সুরক্ষিত রেখেছিল।

দ্বিতীয় পাঠ: ফ্যারাও, পুরোহিত, লিপি ও লিপিকর, গোমস্তা ও মজুর

নতুন পাথর যুগের চূড়ান্ত পর্বে নীলনদের উভয় তীর বরাবর বিয়াল্লিশটি গ্রাম-সংগঠন (গ্রীকরা এর নাম দিয়েছিল 'নোম') গড়ে উঠেছিল। এই গ্রামসংগঠনগুলিই নগর-সভ্যতার ভিত তৈরি করেছিল। নীলনদের জলের ভাগ ও পলি-সমৃদ্ধ জমির ভাগ নিয়ে এই গ্রামগুলির মধ্যে মারামারি কাটাকাটি লেগে থাকত। এই বাস্তব অবস্থা শক্তিশালী রাজতন্ত্রের সৃষ্টি করে। ঘটলও তাই—দক্ষিণ মিশরের একটি নোমের সর্দার মেনেস অন্যান্য নোমগুলি দখল করে একচ্ছত্র শাসক হয়ে বসলেন। রাজতন্ত্র শুরু হ'ল। প্রাচীন মিশরের ইতিহাসে মোট ৩০টি রাজবংশের রাজত্বকাল সম্বন্ধে জানা যায়—এর স্থায়িত্বকাল গ্রীস্টপূর্ব ২৯৫০ সাল থেকে গ্রীস্টপূর্ব ১১০০ সাল পর্যন্ত। এই রাজাদের বলা-হ'ত ফ্যারাও।

মিশরীয় রাজা (ফ্যারাও)

ফ্যারাওদের কাজ ছিল বহুবিধ। অন্তর্দ্বন্দ্ব বন্ধ করা, বহিঃশত্রুর আক্রমণ রোধ করা, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য চেষ্টা করা আর যাদুবিদ্যার দ্বারা যথা সময়ে, রোদ, বৃষ্টি ও বন্যার ব্যবস্থা করা।

তবে ফ্যারাওদের সবচেয়ে বড় কাজ ছিল সম্ভবত তাঁদের কবরের আয়োজনকে সম্পূর্ণ করা। প্রজারা বিশ্বাস করত যে 'সূর্যপুত্র' ফ্যারাও-এর মৃত্যু নেই। কবরের মধ্য থেকেও তিনি যাতে প্রজাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর রাখতে পারেন তার খুটিনাটি সমস্ত আয়োজন প্রজাদের স্বার্থেই ফ্যারাওদের করে রাখতে হ'ত।

প্রকৃতির সদয় দাক্ষিণ্যে মাঠ তাদের ফসলে ভরে যেত—ফলে সমাজের অবস্থাটা ছিল প্রাচুর্যের আর সমৃদ্ধির। এ অবস্থায় স্বাভাবিক কারণেই তাদের মধ্যে রক্ষণশীলতা এসে গিয়েছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল যে তারা এতকাল জীবনের যে ছক অনুসরণ করে এসেছে তা নির্ভুল বলেই অলৌকিক শক্তি তাদের প্রতি সদয়। সুতরাং ভবিষ্যতেও সেই ছক মেনে চলতে হবে—রীতি, আচার, অনুষ্ঠান, কোথাও এতটুকু নড়চড় হবে না। পাশাপাশি নানান যাদু ক্রিয়ার অনুষ্ঠান চালাতে হবে যাতে ঠিক সময়ে নীলনদে বান আসে, যথা সময়ে বৃষ্টি আর রোদ পাওয়া যায়। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি করতে হ'ত পুরোহিতদের। ফলে যাদু-বিশ্বাসী নাগরিকদের মধ্যে পুরোহিতদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল।

নতুন পাথর যুগ থেকেই মিশরীয়দের মধ্যে একধরণের লিপির প্রচলন ছিল। এগুলোর মধ্যে ছবির রূপটাই ছিল বেশী। এগুলো ছিল ভাবব্যঞ্জক চিত্রলিপি। প্রথম রাজা মেনসের সময় থেকেই এই ভাবব্যঞ্জক চিত্রলিপির স্থান নিচ্ছে শব্দব্যঞ্জক সাংকেতিক চিহ্ন। অল্প-কালের মধ্যেই চব্বিশটি বর্ণ তৈরি করে একটি সুশৃঙ্খল লিখন-পদ্ধতি চালু করা হয়। এই লিপির নাম দেওয়া হয়েছে 'হায়ারোগ্লিফিক' লিপি।

হায়ারোগ্রিফিক বা চিত্রলিপি

কৃষি ও বিশাল নির্মাণকার্যে যে সমস্ত মানুষ নিযুক্ত থাকত সম্ভবত

তারা ছিল দাস। শিল্প ও বাণিজ্য যাদের শ্রমে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল তারাও ছিল দাস। যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বিপুল জনগোষ্ঠীকে দাসত্ব মেনে নিতে বাধ্য করতে হবে এটা ছিল নগরসভ্যতার প্রাথমিক শর্ত।

তৃতীয় পাঠ ঃ বাণিজ্য

মিশরের মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনে লাগে এমন পণ্যসামগ্রী মিশরেই তৈরি হ'ত। এ বিষয়ে মেসোপটেমিয়ার ঠিক বিপরীত অবস্থা ছিল মিশরের। কিন্তু নানারকম বিলাসদ্রব্য, যাদু-দ্রব্য ও মশলাপতি তাদের বাইরে থেকে সংগ্রহ করে আনতে হ'ত। যেহেতু রাজার ও সমাজের উচ্চবর্গের মানুষের প্রয়োজন মেটাতেই এসবের দরকার হ'ত সেজন্য রাজকোষের খরচেই একটি সুশৃঙ্খল বাণিজ্য-সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছিল। এই সংগঠনে যুক্ত ছিল বণিক, নাবিক, পণ্য-বাহক, হিসাবরক্ষক ও যোদ্ধা। এরা নানা অঞ্চল থেকে সোনা, তামা, ম্যালাকাইট, কাঠ, গন্ধদ্রব্য, মশলাপাতি ও রঙিন পাথর সংগ্রহ করে আনত। রাজকীয় যোদ্ধাবাহিনী থাকত এই বাণিজ্য-বহরগুলির পাহারায়।

চতুর্থ পাঠ ঃ পিরামিড

প্রাচীন মিশরের প্রায় সমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনই সেখানকার কবর খুঁড়ে তুলে আনতে হয়েছে। কবর বললে মিশরের কবর সম্বন্ধে ধারণা করা যাবে না। এখানকার কবরগুলো এমন করে সাজানো যাতে মৃতব্যক্তি তার জীবিতকালের সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দের উপকরণ সেখানে পায়। সময়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে নাগরিক জীবনে প্রাচুর্য এসেছে। তার প্রতিফলন ঘটেছে কবরগুলোতে। প্রথমদিকে সেখানে থাকত ঘরোয়া উপকরণ, পরে সেখানে দেখা যাচ্ছে বিদেশ থেকে আনা নানা বিলাস সামগ্রী। প্রথমদিকে কবরগুলো ছিল ছোট আকারের— ছোট

একটি গর্তের উপর ছোট একটি স্তূপ। মেনেসের রাজত্বকাল থেকে দেখা যায় কবরগুলো বৃহদায়তন হয়ে উঠেছে—বাড়ছে ভেতরের ঐশ্বর্য, আসবাব, হাতিয়ার, অলংকার, খাদ্য ও পানীয়। আরও পরে এসে দেখা যায় সমাধি সৌধ তৈরি হচ্ছে ইট দিয়ে নয়, মস্ত মস্ত পাথরের চাঁই সাজিয়ে। এই চাঁই সাজানোর ধরণেরও ধীরে ধীরে পরিবর্তন হয়েছে। প্রথমদিকে চাঁই-গুলো সাজানো হয়েছিল ধাপ তুলে তুলে, পরে তৈরি হয়েছিল আসল পিরামিড।

পিরামিড

এই আসল পিরামিডের যে কোন একটির মোটামুটি হিসাব পেলে নির্মাণকার্যের বিশালত্ব সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা যাবে। কায়রোর কাছে গিজা-র পিরামিডটি তৈরি করতে প্রায় আড়াই লক্ষ চাঁই লেগেছিল। চাঁইগুলির গড় ওজন সত্তর মণ। জমির উপর প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য ছিল ৭৫৫ ফুট আর উচ্চতা ৪৮১ ফুট। নীলনদের পূর্ব তীরের তুরা থেকে সংগ্রহ করা পাথর জলে ভাসিয়ে পশ্চিম তীরের গিজা পর্যন্ত এনে একশো ফুট উঁচু জায়গায় টেনে তুলতে একলক্ষ মানুষের দশ বছর সময় লেগেছিল। আরও দশ বছর লেগেছিল পিরামিডটি গেঁথে তুলতে।

এই পিরামিড নির্মাণ কার্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল আধুনিক বিজ্ঞানের অনেকগুলি জটিল তত্ত্ব। গোড়াতেই নির্ভুলভাবে সমস্ত মাপজোকের কাজ সেরে নিতে হ'ত—এজন্য স্থাপত্যবিদ্যার যথেষ্ট দখল থাকা চাই। বলবিদ্যা ও চাপতত্ব আয়ত্তে না থাকলে পাথরের চাঁইগুলিকে উপরে টেনে তুলে খিলান আকারে সাজানো যেত না। এরপর সমস্ত উপকরণ ও শ্রমকে সুশৃঙ্খলভাবে কাজে লাগিয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছবার জন্য দরকার হ'ত নিখুঁত তদারকির।

এরপরে ডাক পড়ত ভাস্করদের। রাজা এবং তাঁর অন্তরঙ্গ

পারিষদবর্গের মূর্তি খোদাই করতে হত কাঠ বা পাথর দিয়ে। পিরামিডের অভ্যন্তরে দরবার কক্ষে এই মূর্তিগুলি সাজিয়ে রাখা হত। পরের দিকে অবশ্য ভেষজবিদ্‌দের দিয়ে রাজার মৃতদেহকেই পচনমুক্ত করে রাখা হত বিশেষ প্রক্রিয়ায়। এভাবে সংরক্ষিত মৃতদেহকে বলে মমি।

পঞ্চম পাঠঃ ধর্ম বিশ্বাস

মৃতুর পরে একটা জীবন আছে এই গভীর বিশ্বাস ছিল মিশরীয়দের সমস্ত রকম আচার অনুষ্ঠানের মূলে। তাদের এই বিশ্বাসের বাস্তব ভিত্তি ছিল সূর্য আর নীলনদ। তারা দেখত দিনের শেষে যে সূর্যের মৃত্যু হল পরদিন সেই সূর্য আবার জীবন ফিরে পেয়েছে। নীলনদের প্লাবন ফুরিয়ে এলেই তার দেহে ফুটে ওঠে মৃত্যুর লক্ষণ। বছর শেষে আবার সেই প্লাবনে উত্তাল হয়ে ওঠে নীলনদ। তারা বিশ্বাস করত মানুষের জীবনটাও এইরকম—কখনই একেবারে ফুরিয়ে যায় না। নতুনভাবে আবার তার প্রকাশ ঘটে।

এজন্যই দেখা যেত জীবিতকালেও তাঁরা গভীর আগ্রহ নিয়ে মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য আয়োজন করত। রাজাদের ক্ষেত্রে আয়োজনটা হ'ত রাজকীয়। অবশ্য তার কারণও ছিল। প্রজারা রাজাকে জানত ঈশ্বরের সন্তান ব'লে। নানারকম যাদুক্রিয়ার দ্বারা রাজা যথাসময়ে বন্যা, বৃষ্টি আর রোদের ব্যবস্থা করেন, দুর্ভিক্ষ মহামারী দূর করেন—শস্যে, সম্পদে দেশ ভরে ওঠে। তারা বিশ্বাস করত মৃত্যুর পরেও রাজার অলৌকিক ক্ষমতা বজায় থাকে। প্রজাদের মঙ্গলের জন্য রাজা কবরের মধ্যে থেকেও যাতে তাঁর যাদু প্রভাব বিস্তার করতে পারেন তার ব্যবস্থা প্রজাদেরই করতে হত সমবেতভাবে।

মিশরীয়রা ছিল টোটেম বিশ্বাসী। পশু, পাখী বা গাছ গাছড়ার প্রতীক ব্যবহার করত বিভিন্ন গ্রাম-সংগঠন বা নোম-এর মানুষেরা

এরা নিজেদের ঐ সমস্ত পশু পাখী বা গাছ-গাছড়ার বংশধর বলে ভাবত।

এরা নানারকম যাদু ক্রিয়ায় বিশ্বাস করত। যাদু ক্রিয়ার গুণে বিভিন্ন রকমের উজ্জ্বল পাথর মানুষের সাফল্যকে সুনিশ্চিত করতে পারত। এই যাদুর গুণকে আরো বাড়ানো যেত জিনিষগুলোকে নির্দিষ্ট আকার দিতে পারলে। দেখা গেল, পাথরের গায়ে একটি চিহ্ন খোদাই করে সেটিকে কাদামাটির উপর চেপে ধরলে তাতে ফুটে ওঠে চিহ্নটির প্রতিচ্ছবি। মানুষ ভাবত এতে পাথরের অলৌকিক শক্তির কিছুটা চলে গেল কাদামাটিতে—সেখানে সঞ্চারিত হ'ল যাদুগুণ। বলা হল বিশেষ চিহ্ন সম্বন্ধে বিশেষ আচার বা নিষেধ না মানলে মানুষের জীবনে চরম সর্বনাশ নেমে আসবে। এই বিশ্বাসের নাম ট্যাবু।

এই সমস্ত বিশ্বাস আর সংস্কার কিন্তু পরোক্ষভাবে মানুষের অশেষ কল্যাণসাধন করেছিল। পিরামিড নির্মাণের বিশাল কর্মকাণ্ড ছিল কতকগুলো সংস্কার ও আচার অনুষ্ঠানকে ঘিরে। অথচ আমরা দেখেছি এই বিরাট উদ্যোগ কত রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ করে দিয়েছে স্থপতি, কারিগর, ভাস্কর আর ভেষজবিদ্‌দের সামনে। একটির পর একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়েছে—মানুষের দক্ষতা বেড়ে গেছে ক্রমাগত। অন্য কোন ভাবে এ ব্যাপার হতে সময় লাগত অনেক। এভাবে দেখা যায় প্রায় সমস্ত সংস্কার আর আচার কোন না কোন নতুন আবিষ্কারের পরিবেশ গড়ে দিয়েছে।

ষষ্ঠ পাঠ : প্রধান প্রধান পেশা

আমরা জেনেছি মিশরীয়দের জীবন আবর্তিত হ'ত যে মূল বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে তা হ'ল মৃত্যুর পরও জীবন আছে। সেই জীবনের জন্য সমস্ত রকম প্রস্তুতি সারতে হবে, সমস্ত রকম রসদ জোগাড় করতে হবে—এ তাগিদ রাজার ছিল, প্রজারও ছিল। এজন্য

রাজা গড়ত পিরামিড, তাকে সাজাত বিদেশ থেকে আনা নানা মহার্ঘ্য উপকরণ দিয়ে। সর্বোচ্চ গুরুত্বের এই কাজগুলি করার জন্য রাজ-কোষের অর্থে প্রতিপালিত হ'ত বিপুলসংখ্যক কর্মী। এরা হ'ল বণিক, নাবিক, যোদ্ধা, ভারবাহী-মজুর, স্থপতি, ভাস্কর, কাঠ ও ধাতুর কারিগর, ভেষজবিদ, মনিকার, মৃৎশিল্পী ইত্যাদি। এদের কাজ ছিল বিভিন্ন জায়গা থেকে পিরামিডের পাথর থেকে শুরু করে নানা ধরণের বিলাস সামগ্রী সংগ্রহ করে আনা, পিরামিড গড়া, তার অভ্যন্তরভাগ মূল্যবান আসবাব, অলংকার, বিলাসবস্তু, গন্ধদ্রব্য, খাদ্য ও পানীয় দিয়ে সুসজ্জিত করা, কাঠ বা পাথর খোদাই করে রাজা আর তাঁর পারিষদের প্রতিমূর্তি তৈরি করা অথবা মৃত রাজা আর তাঁর নিহত পারিষদদের দেহগুলি ভেষজ দিয়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।

এই বিশাল কর্মযজ্ঞ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য যে জিনিষটার প্রয়োজন ছিল বেশি তা হ'ল বিপুল পরিমাণ মজুত শস্য। কারণ উদ্বৃত্ত শস্যই ছিল একমাত্র পুঁজি। সেজন্য চাষের কাজও ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য খাল কেটে জলসেচের ব্যবস্থা তো করা হতই, আর করা হ'ত নানা রকম যাদুক্রিয়ার অনুষ্ঠান। এমন রাজার সম্বন্ধে জানা যায় যিনি জলসেচের খাল কাটার জন্য নিজেই কোদাল ধরেছিলেন।

নিয়মিত সেনাবাহিনী রাখার প্রয়োজনও দেখা দিয়েছিল রাজ্যের সমৃদ্ধি বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে। আশেপাশের যাযাবর গোষ্ঠীগুলির আকস্মিক হামলার মোকাবিলা করার জন্য সীমান্তে সৈন্য মোতায়েন রাখতে হ'ত।

অবশ্য সমাজে রাজার পরই ছিল পুরোহিতের স্থান। তাদের কাজ ছিল নানারকম যাদুক্রিয়ার অনুষ্ঠান ক'রে প্রকৃতিকে সদয় রাখা।

তৃতীয় পর্ব ॥ সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা

প্রথম পাঠ : অবস্থান ও পটভূমি

ভারতের উত্তর-পশ্চিমে একদিকে সিন্ধু ও পঞ্চনদের জলধারা অপরদিকে সরস্বতী নদীর জলধারা—মধ্যবর্তী দীর্ঘ ও বিস্তৃত ভূভাগে গড়ে উঠেছিল এই সভ্যতা। আয়তনে এই অঞ্চল মেসোপটেমিয়া
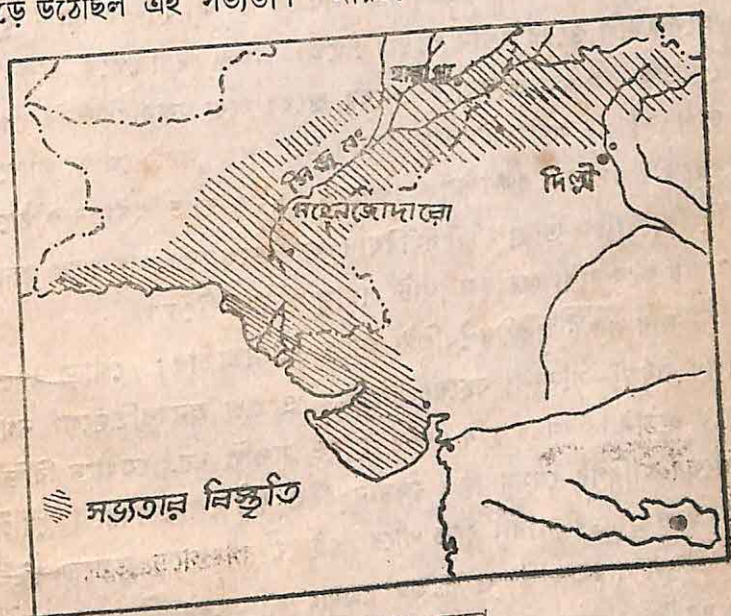
সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা

বা মিশরের চেয়ে অনেক বড়—কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণও অনেক বেশি। সিন্ধু ও পঞ্চনদের দীর্ঘ জলপথ থাকায় এই সভ্যতার সব কটি কেন্দ্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। ভৌগোলিক দিক থেকে এই অঞ্চল ছিল অবিচ্ছিন্ন।

দু'টি নগরকে কেন্দ্র করে এই সভ্যতার বিকাশ। উত্তরে হরপ্পা ও দক্ষিণে মহেঞ্জোদারো—উভয়ের মধ্যে ব্যবধান চারশো মাইলের। অথচ দুটি নগরের মধ্যে সমস্ত বিষয়েই পুরোপুরি মিল লক্ষ্য করার

মত। এই দু'টি নগর ছাড়াও এই এলাকায় আরও অনেকগুলি জনবসতির নিদর্শন পাওয়া গেছে। বিরাট এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও জীবনযাত্রা, বাসগৃহ নির্মাণ কৌশল, পোড়ামাটির পাত্র, সীলমোহরের ছবি ও লেখা—সব এক রকমের। এসব থেকে অনুমান করা চলে যে গোটা অঞ্চলটি ছিল একটি মাত্র রাজ্য এবং হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো ছিল এই রাজ্যের যুগল রাজধানী।

নগর দু'টি থেকে শুরু করে সব ক'টি জনবসতির মাটি খুঁড়ে অনেকগুলি স্তরের সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু দেখা গেছে একেবারে গোড়ার স্তর এবং একেবারে শেষের স্তরের মধ্যে ক্রমবিবর্তনের কোন ছাপ নেই। অথচ এই ভাঙ্গা-গড়ার মধ্য দিয়ে কেটে গেছে সাতশো বছর। এতখানি রক্ষণশীলতা কিভাবে সম্ভব? হয়ত প্রশাসন কাঠামো ছিল পুরোহিত-তান্ত্রিক। ধর্মবিশ্বাস আর সংস্কারের নাগপাশে অনড় অব্যয় করে রাখা হয়েছিল গোটা সমাজ কাঠামোটিকে।

আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আছে এই সভ্যতার। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত—সাতশো বছরের বিবর্তনে ও অন্য জনবসতিগুলো নগর হয়ে ওঠেনি। অথচ কৃষি-নির্ভর গ্রামও সেগুলি নয়, যেখানে বিভিন্ন শিল্পের কারিগর যেমন ছিল তেমনি ছিল সুষ্ঠু লেনদেনের উপযোগী ব্যবস্থাও। এর ব্যাখ্যা হতে পারে এই যে নগর গড়ে তুলতে হ'লে যে বিপুল পরিমাণ উদ্বৃত্ত শস্যের দরকার তা' এদের ছিল না অথবা এদের উদ্বৃত্ত শস্যের সিংহভাগ নগর দু'টির দখলে চলে যেত।

দ্বিতীয় পাঠ : নগর পরিকল্পনা

ইরাবতী নদীর বন্যা এলাকার মধ্যেই অবস্থান ছিল হরপ্পা নগরের। পশ্চিমদিকের দুর্গ প্রাকারের উঁচু চাতালটি সম্ভবত বন্যারোধের জন্য তৈরি হয়েছিল। মহেঞ্জোদারোর অবস্থান সিন্ধুনদের ধারে। এই নগরের পশ্চিমেও বন্যার জল রুখবার জন্য বাঁধ দেওয়া ছিল। বাঁধের উপর ছিল দুর্গপ্রাকার। দুই নগরের নির্মাণ কৌশল ছিল অভিন্ন

ধরণের, তুর্গ প্রাকারের উপর ছিল শাসকদের বাসভবন। এর নীচে সুবিস্তীর্ণ নগর—আয়তন কমপক্ষে এক বর্গমাইল করে। নগরের উত্তর থেকে দক্ষিণে আর পূর্ব থেকে পশ্চিমে টানা সিধে চওড়া রাজপথ প্রায় সমান মাপের বারোটি পল্লীতে বিভক্ত মহেঞ্জোদারো নগরটি।

বাড়িগুলি সমান মাপের পোড়া ইটে তৈরি। চারিদিকে দালান, মাঝখানে চৌকো বাঁধানো চত্বর, বড়ো রাস্তা থেকে বেরিয়ে আসা গলিতে প্রবেশ পথ—এই ছিল বাড়িগুলির সাধারণ পরিকল্পনা। বাড়ীগুলি তুই বা ততোধিক তলাবিশিষ্ট। ঘরের ভিতরের দেওয়ালে কাদামাটির প্রলেপ দেওয়া হ'ত। কাঠের বরগা ব্যবহার করা হত; ছাদে ওঠার সিঁড়ি ছিল সব বাড়িতেই। স্নানের ঘর থাকত—সেখান থেকে নর্দমা বেরিয়ে যুক্ত হ'ত রাস্তার ধারের বড়ো নর্দমার সঙ্গে। এই বড়ো নর্দমার জঞ্জাল সরাবার জন্য তার উপর ইটের ঢাকা 'ম্যান হোল' ছিল। বাড়ির আবর্জনা ফেলা হ'ত বাড়ির বাইরের দেওয়ালের গায়ে ইটে তৈরি চৌকা 'ডাস্টবিন'-এ। সেখান থেকে এই আবর্জনা অপসারণের কোন ব্যবস্থা নিশ্চয়ই ছিল।

বসবাসের জন্য যে বাড়িগুলি তৈরী হয়েছিল তাদের আকার আয়তম দেখে মনে হয় নগরে তিন ধরণের 'মানুষ' বাস করত—বিত্তশালী, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত। এই নিম্নবিত্ত শ্রমজীবিরা বাস করত সারিবদ্ধ কুঠুরিতে।

হরপ্পায় পাওয়া গেছে এমনি তুসার কুঠুরির সামনে ইটে বাঁধানো গোলাকৃতি অনেকগুলি চত্বরেরও নিদর্শন, চত্বরের মাঝখানে গোলাকার গর্ত। পুরাবিদদের ধারণা বিরাট কাঠের মুষল দিয়ে এই গর্তে শস্য পেষা হ'ত। এই চত্বরগুলোর অদূরেই ছিল বিরাট শস্যাগার। এই শস্যাগারটি ইট দিয়ে উঁচু করা এবং কয়েকটি অপেক্ষাকৃত ছোট কুঠুরিতে ভাগ করা।

মহেঞ্জোদারোতে পাওয়া গেছে একটি বিরাট স্নানাগারের নিদর্শন। এখানে আছে একটি চৌবাচ্চা। চৌবাচ্চাটি বৃহদাকার। ইটের

গাঁথুনির ফাঁকগুলো পীচ দিয়ে ভরাট করা। চৌবাচ্চার তিনদিকে খিলান দিয়ে ঢাকা রাস্তা আর একদিকে সার সার অনেকগুলি কামরা। পুরাবিদ্‌দের মতে এই কামরাগুলিতে থাকত পুরোহিতরা। নাগরিকরা সম্ভবত এই চৌবাচ্চার জলকে পবিত্র বলে মনে করত এবং এই জল দিয়ে অনেক আচার অনুষ্ঠান পালন করত।

মহেঞ্জোদারোতে দু'টি বড়ো আকারের দালানের নিদর্শন পাওয়া গেছে। একটি দালান অনেকগুলি কামরায় ভাগ করা—এটা কোন ধর্ম প্রতিষ্ঠান-গৃহ হতে পারে। এর পাশের দালানটি হলঘরের আকারের। এখানে সামাজিক বা ধর্মীয় উপলক্ষে নাগরিক সমাবেশ হতে পারত।

তৃতীয় পাঠ ঃ জীবনযাত্রার উপকরণ

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে সিন্ধু উপত্যকার মানুষদের ব্যবহার্য সামগ্রী সম্বন্ধে কিছু সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়।

এই অঞ্চলের মানুষের খাদ্য ছিল আমিষ ও নিরামিষ উভয় ধরণেরই। এদের প্রধান খাদ্য ছিল ধান ও গম। এছাড়া বার্লি, মটর, মাছ, মাংস, খেজুর ও অন্যান্য ফল এবং দুধ ছিল তাদের খাদ্য তালিকায়। আমিষ খাদ্যের মধ্যে ছিল পশু পাখীর মাংস এবং কচ্ছপ। এদের গৃহপালিত পশুগুলির মধ্যে গোরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, কুকুর, বিড়াল, শুয়োর, উট ও হাতি প্রভৃতির নিদর্শন পাওয়া গেছে।

এদের পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে কিন্তু সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। সম্ভবত পুরুষরা ঢিলেঢালা পোষাক ব্যবহার করত। মেয়েদের পোশাক ছিল খাটো ধরণের। সূতীর ও পশমের উভয় ধরণের পোশাকেরই চল ছিল। মেয়েরা লম্বা চুল রাখত এবং খুব পরিপাটি করে চুল বাঁধতো। পুরুষেরা রাখত লম্বা চুল ও দাড়ি। মেয়েরা রং বেরং-এর পাথর, ঝিনুক ও ধাতুর অলঙ্কার দিয়ে দেহসজ্জা করত।

সিন্ধু উপত্যকার কারিগররা তামা ও ব্রোঞ্জ দিয়ে নানা ধরণের হাতিয়ার তৈরি করত। অবশ্য পাথরের হাতিয়ারও একদম অচল

ছিল না। গদা, তীর-ধনুক, কুড়ুল, ছোরা ইত্যাদি সেকালের প্রচলিত প্রায় সমস্ত রকম হাতিয়ারের ব্যবহারই এরা জানত। তবে করাত তৈরিতে এ অঞ্চলের কারিগররা ছিল সবার সেরা। গৃহস্থালীর দৈনন্দিন প্রয়োজনে লাগে এমন অনেক সামগ্রী তামা, ব্রোঞ্জ বা মাটি দিয়ে তৈরি করা হ'ত। তবে সব জিনিষই তৈরি হ'ত সাদামাটাভাবে —নিছক প্রয়োজন মেটাবার তাগিদে। অবশ্য ছোটদের খেলনা হিসাবে তৈরি করা ছোট ছোট পুতুল বা জন্তু-জানোয়ারের মূর্তিগুলি খুব উন্নত শিল্পবোধের পরিচয় দেয়।

যানবাহনের মধ্যে স্থলপথে গোরুর গাড়ির চাকা হত নিরেট আর গোটা অক্ষদণ্ড সমেত চাকা দু'টি ঘুরত। আজও ঐসব অঞ্চলে এই ধরণের গাড়ির চল আছে।

একটি জিনিষ এখানে পাওয়া গেছে বিপুল পরিমাণে—তা' হ'ল সীলমোহর। সম্পত্তির মালিকানার নিদর্শন হিসাবে এবং 'ট্যাবু' বা কোন বিশেষ বিষয়ে বিশেষ ধরণের আচার বা নিষেধ বোঝাতে সম্ভবত এই সীলমোহরগুলি ব্যবহৃত হ'ত। চৌকো পাথরে উৎকীর্ণ থাকত ছবি আর লেখা। বেশির ভাগ ছবির বিষয় ছিল জন্তু-জানোয়ার। লেখাগুলো আজও পড়া যায় নি। পণ্ডিতদের অনুমান এ লেখাগুলোর সঙ্গে কোন না কোন ভাবে ধর্মের যোগ ছিল।
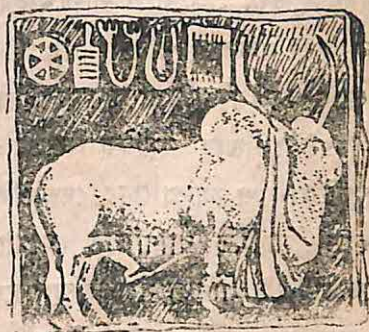
শীলমোহর

চতুর্থ পাঠ ঃ শিল্প, বাণিজ্য ও উপাসনা

সূতীবস্ত্র শিল্পে এই অঞ্চল ছিল অত্যন্ত উন্নত। বুনো তুলো নয় রীতিমত চাষ করা উন্নত মানের তুলো দিয়ে বস্ত্র-বয়ন করা হ'ত। এই রাজ্যের বহির্বাণিজ্যের বেশির ভাগটাই ছিল সূতীবস্ত্র—এটা অনুমান

করা যায়। অন্তত মেসোপটেমিয়া যে এই সূতীবস্ত্রের বড় ক্রেতা ছিল তার প্রমাণ এই যে মেসোপটেমিয়ার সূতীবস্ত্রকে বলা হ'ত 'সিন্ধু'। ধাতু-শিল্পে অবশ্য এই সভ্যতা বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি অপর দু'টি সভ্যতার তুলনায়।

এদেশের কামারশালায় তৈরি হ'ত ছোরা, কুড়ুল, করাত ইত্যাদি। ছোরার ফলার মাঝখানে শিরা না থাকায় তা' সহজেই বেঁকে যেত। কুড়ুলে হাতল লাগাবার ফুটো না থাকায় হাতলের সঙ্গে তা' বেঁধে নিতে হ'ত। কিন্তু করাত ছিল সবচেয়ে সেরা—দাঁতগুলো হ'ত ঢেউ-খেলানো। এ থেকে অনুমান করা যায় যে এ অঞ্চলের কাঠের কারিগররা তাদের কাজে খুবই দক্ষ ছিল। পোড়ামাটির পাত্র যা পাওয়া গেছে তার বেশির ভাগই খুব মামুলি ধরণের—প্রয়োজন মেটানোই ছিল বড়ো কথা। তবে রং করা যে কটি পাত্র পাওয়া গেছে তার শিল্পকর্ম অতি উন্নত মানের। ব্রোঞ্জ, পাথর বা পোড়ামাটির যেসব পুতুল, খেলনা ও সীলমোহর পাওয়া গেছে সেগুলি শিল্পীদের অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেয়। সীলমোহরের ক্ষুদ্রে পরিসরে জীব-জন্তুর মূর্তিকে নিখুঁতভাবে খোদাই করা সহজ কাজ ছিল না।

এই সভ্যতার সমৃদ্ধির অন্যতম প্রধান উৎস ছিল এর বহির্বাণিজ্য। বেলুচিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে হরপ্পার বাণিজ্য ঘাঁটি ছিল। এছাড়া নিয়মিত বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল আরো দূর দূর দেশের সঙ্গে। এই বাণিজ্য সম্ভবত স্থলপথেই চলত। মাটির পাত্রে ও সীল-মোহরে নৌকোর যে দুটি নিদর্শন পাওয়া যায় সেগুলির আকার-আয়তন মোটেই সমুদ্রগামী জলযানের মত নয়। বাইরে থেকে আনা হ'ত মূল্যবান পাথর, ধাতু আর রং বেরং-এর ঝিনুক। বাইরে যেত সূতীবস্ত্র।

হরপ্পা রাজ্যে সম্ভবত পুরোহিততন্ত্র চালু ছিল। ফলে ধরে নেওয়া হয় নানা রকম আচার অনুষ্ঠান ও যাদু বিশ্বাস প্রচলিত ছিল, প্রচলিত ছিল দেব দেবীর উপাসনা। এই রকম এক দেবী হলেন দেবী-মাতৃকা। সম্ভবত এঁর উপাসনা চলত ঘরে ঘরে। আর এক দেবী হলেন

শস্যমাতা। ইনি সম্ভবত শস্যের দেবী। দু'টি শিঙ্ তিনটি মুখ-বিশিষ্ট এক পুরুষ দেবতা পূজা পেতেন। যোগাসনে উপবিষ্ট তাঁর মূর্তি—তাঁকে ঘিরে আছে কয়েকটি প্রাণী। পশু-উপাসনা তো' প্রচলিত ছিলই, তার সঙ্গে ফুল, লতাপাতা, গাছপালাও বাদ যেত না। সেই আদিম টোটেম-বিশ্বাস এ যুগেও অব্যাহত ছিল।

পঞ্চম পাঠ : সমাজে শ্রেণীবিন্যাস

এখানকার সমাজ ছিল শ্রেণীবিভক্ত। একদিকে বিত্তশালী, অপর-দিকে বিত্তহীন। মাঝে আর একটি শ্রেণীর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে এখানে যাদের সংখ্যাও কম নয়। এরা মধ্যবিত্ত। এ তথ্যগুলি সবই অনুমান নির্ভর। অনুমানের ভিত্তি, এখানে যে বাসগৃহের নিদর্শন পাওয়া গেছে সেগুলি। এখানে এমন বাসগৃহ দেখা যায় যেগুলিতে প্রাচুর্যের ছোঁওয়া আছে। আবার আধুনিক কালের কুলি-ব্যারাকগুলির মত সারিবদ্ধ ছোট কুঠুরিও দেখতে পাওয়া যায়।

আমরা আগে জেনেছি যে নগর সভ্যতা গড়ে ওঠার একটা বড়ো শর্ত হল শ্রমজীবী মানুষ বাধ্যতামূলক শ্রম দিয়ে প্রচুর উদ্বৃত্ত তৈরি করবে আর সেই উদ্বৃত্ত গিয়ে সঞ্চিত হবে মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে। একদিকে বাড়বে প্রাচুর্য আর একদিকে বাড়বে দারিদ্র্য। নগরসভ্যতার বহিরঙ্গে ফুটে উঠবে জৌলুষ আর তার জন্য নিঃশব্দে শ্রম যোগাবে অগণিত শ্রমজীবী মানুষ। এই নগর সভ্যতার সমৃদ্ধিও গড়ে উঠেছিল ঐ নিয়মেই। যে নিম্নবিত্ত মানুষের কথা বলা হয়েছে তারা দাসও হতে পারে, হতে পারে নানান নিয়ম-নিষেধের নিগড়ে বাঁধা আপাত স্বাধীন শ্রমজীবী মানুষ। তবে অনুমান করা যায় যে এখানে শোষণ তত চরমে ওঠেনি আর সেইজন্যই সাতশো বছরেও সভ্যতা প্রায় এক জায়গায় স্থির ছিল। উপযুক্ত পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও নতুন কোন নগরও গড়ে ওঠেনি হয়ত এই কারণেই।

চতুর্থ পর্ব ।। চীন সভ্যতা

প্রথম পাঠ : হোয়াং হো-ইয়াংসিকিয়াং উপত্যকার নিদর্শন

নগর বিপ্লবের আর একটি কেন্দ্র ছিল চীনের হোয়াং হো নদীর উপত্যকা। পুরানো পাথর যুগে চীনের 'পিকিং মানুষ'দের কথা আমরা আগে আলোচনা করেছি। নতুন পাথর যুগের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া গেছে ইয়াংসিকিয়াং নদী উপত্যকা জুড়ে। ব্রোঞ্জ যুগের নগর সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে হোয়াংহো নদীর উপত্যকায়। তবে এই সভ্যতা সুমের বা মিশরের মত অত প্রাচীন নয়।

এই যুগের চীনারা ধান, যব, ভুট্টা ও অন্যান্য শাকসব্জী উৎপন্ন করত। অনেকে আবার পশুপালনও করত। প্রাচীনকাল থেকেই চীনে ক্রীতদাসপ্রথা প্রচলিত ছিল এবং ক্রীতদাসরা তাদের মালিকদের দ্বারা অত্যাচারিত হত।

বিশাল চীন জুড়ে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা শুরু হয়েছে বেশি দিন নয়। ফলে এই সভ্যতার সম্পূর্ণ পরিচয় পেতে হলে আরো অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। অবশ্য চীনের পুরানো দিনের কাহিনীতে আর লোক কথায় ছড়িয়ে আছে অনেক তথ্য। তবে সেগুলিরও প্রত্নতাত্ত্বিক সমর্থন দরকার।

এই সব পুরানো দিনের কাহিনী পড়ে জানা যায় যে প্রাচীনকালে চীনে প্রায়ই বন্যা ও অজন্মা হ'ত। প্রাচীন চীনের লোকেরা বন্যা বা অজন্মাকে ক্ষতিকারী বাতাস ও বৃষ্টির দেবতার কাজ বলে মনে করত। এই দুই দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তারা জীবজন্তু, এমন কি মানুষ পর্যন্ত উৎসর্গ করত। দেবতাদের কাছে উৎসর্গের নামে ক্রীতদাসদের পুড়িয়ে মারত অথবা নদীর জলে ডুবিয়ে হত্যা করত।

বন্যা নিয়ে প্রাচীনকালের চীনাদের মধ্যে অনেক কাহিনী চালু ছিল। এই রকম একটা কাহিনীতে আছে যে চীনদেশে একবার

ভীষণ বন্যা হয়। এই বন্যায় পাহাড়ের চূড়া ছাড়া দেশের সব জমি-জায়গা ডুবে যায়। চীনের লোকেরা পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। এই বন্যা দশ বছর ধরে চলে। শেষে 'ই' নামে এক বীরপুরুষ নদীর তলা কেটে তার গভীরতা বাড়িয়ে দেয়। তার পরেই নদীর জল সরে যায় এবং মানুষেরা পাহাড়ের চূড়া থেকে নেমে সমতল মাটিতে বসবাস শুরু করে। এই কাহিনীতে এইটুকু বোঝা যায় যে হোয়াং হো নদীতে বড় বড় বন্যা হ'ত এবং প্রাচীন চীনের লোকেরা বন্যার সঙ্গে লড়াই করে, নদীতে খাল কেটে হোয়াং হো-র তীর-ভূমিকে বসবাসের যোগ্য করেছিল।

পঞ্চম পর্ব

নদীমাতৃক সভ্যতাগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য

প্রথম পাঠ ঃ সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক বৈশিষ্ট্য

নদীমাতৃক সভ্যতাগুলির বিকাশ ঘটেছিল নদী উপত্যকার পলি-এলাকাতে। আমরা আগে জেনেছি যে নতুন পাথরের যুগে মানুষ যখন চাষের এলাকা বাছাই করে নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিল তখন নানান সুবিধার কথা চিন্তা করে পলি-সমৃদ্ধ নদী এলাকাগুলিই বেছে নিয়েছিল।

নতুন পাথর যুগের শেষদিকে তামা, চাকা, নৌকোর পাল ইত্যাদি অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার মানুষের জীবনযাত্রার ধরণটাকে পাল্টে দিয়েছিল। মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহার্য সামগ্রীগুলির মধ্যে গুণগত ও পরিমাণগত পরিবর্তন এসে গিয়েছিল। যেমন পাথরের হাতিয়ারে আর কাজ চলছে না, এখন উন্নততর ধাতব হাতিয়ার চাই। আবার চাহিদা শুধু এক ধরণের অনেক জিনিষের নয়, অনেক ধরনের অনেক জিনিষের। ফলে আগের মত ঘরোয়াভাবে উৎপাদন চালিয়ে চাহিদার সঙ্গে তাল রাখা যাচ্ছিল না। ক্রমবর্ধমান চাহিদার চাপ ঠেকাবার জন্য প্রথমে শিল্প উৎপাদন-ব্যবস্থাকে মেয়েদের হাত থেকে পুরুষদের হাতে আনা হ'ল এবং পরে সেখানে পুরো সময়ের জন্য কর্মী নিয়োগ করা হ'ল।

কিন্তু বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করলেই তো চলবে না, শিল্পের কাঁচামালের যোগান বৃদ্ধির ব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে করতে হবে। এই সময় শিল্পের কাঁচামাল বলতে আমরা বুঝি কাঠ, আকর আর পাথর —যে সব জিনিষের বিশেষ অভাব নদী উপত্যকার পলি এলাকা-গুলিতে। ফলে এগুলি খুঁজে পেতে সংগ্রহ করে আনতে হবে দূরের ও নিকটের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। আর তার জন্যও চাই বিশেষ ধরনের সংগঠন—বাণিজ্য সংগঠন। এখানেও পুরো সময়ের কর্মী চাই।

মনে হতে পারে, নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হ'ল, এতে অসুবিধা কি? কিন্তু যে সময়ের কথা আমরা আলোচনা করছি তখন কিছু অসুবিধা ছিল। এতকাল নিয়ম ছিল যে চাষের কাজ থেকে রেহাই নেই। কিন্তু এখন বেশ কিছুসংখ্যক মানুষকে রেহাই দেবা দরকাল হ'ল। তা না হয় করা হ'ল, কিন্তু আর একটি অসুবিধা—এত এত মানুষ, যারা চাষের কাজ করবে না, তাদের খাদ্যের সংস্থান হবে কিভাবে? এ অসুবিধারও একটা মীমাংসা হ'ল—গোষ্ঠির উদ্বৃত্ত শস্যভাণ্ডার থেকে এদের খাদ্য যোগানোর ব্যবস্থা হ'ল। এইভাবেই পুরানো স্বয়ংভর গ্রামসমাজগুলি ভেঙে গেল—শিল্প ও বাণিজ্য নির্ভর নগর সভ্যতার ভিত তৈরি হ'ল।

ঘটনাস্রোত কিন্তু এখানেই মন্থর হ'ল না। এরপর ঘা পড়ল মানুষের স্বাভাবিক সম্পর্কের উপর। শিল্প ও বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা উদ্বৃত্ত ফসলের ভাগ পাচ্ছে এটা আমরা জেনেছি। এ মানুষগুলো কিন্তু এল চাষের কাজ ছেড়ে—ফলে চাষের কাজের মানুষ কিছু কমে গেল। স্বভাবতই উদ্বৃত্তের পরিমাণও কিছু কমল। ওদিকে শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে উদ্বৃত্তের উপর চাপটাও গেল বেড়ে। উদ্বৃত্তের পরিমাণ কমছে কিন্তু তার উপর চাপ বাড়ছে। এই অবস্থার প্রতিকারের উপায় উদ্বৃত্ত মজুত বাড়ানো। সেটা করা যায় জমির পরিমাণ বাড়িয়ে এবং চাষীদের আরো শ্রম দিতে বাধ্য করে। এ কাজগুলো বুঝিয়ে সুজিয়ে করা যাবে না—করতে হবে গায়ের জোরে। এই পথই নেওয়া হ'ল—এল যুদ্ধ, গোষ্ঠিতে গোষ্ঠিতে লড়াই। লড়াই জিতে হাতে এল আর একটি উদ্বৃত্ত ভাণ্ডার এবং বেশ কিছু-সংখ্যক মানুষ। দখল-করা উদ্বৃত্ত ফুরিয়ে গেল অল্পদিনেই কিন্তু মানুষগুলোকে জমিতে বাড়তি শ্রম দিতে বাধ্য করা গেল। এল দাস-প্রথা, নতুন উদ্বৃত্তের সম্ভাবনা তৈরি হ'ল, কিন্তু আদিম সাম্যসমাজ ভেঙ্গে গেল। নতুন সমাজ গড়ে উঠল, যে সমাজে দেখা গেল দুটি শ্রেণীর—একটি প্রভু, অপরটি দাস।

এটা অবশ্যই একটা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া ব্যবস্থা। অধিকাংশ মানুষের সম্মতিতে যে ব্যবস্থা গড়ে উঠল না, সতর্ক তদারকি না থাকলে তা ভেঙ্গে যেতে পারে। সুতরাং এই সতর্ক তদারকির প্রয়োজনে গড়ে উঠল রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্র পরিচালনায় কোথায় এল রাজা কোথাও বা পুরোহিত। নগর-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে মিশরে প্রচলিত হয়েছিল রাজতন্ত্র, সুমের ও হরপ্পায় সম্ভবত পুরোহিত তন্ত্র। নাম আলাদা হলেও কাজের ধরন এক।

নগর-রাজ্য গড়ে ওঠার এঈ মূলগত সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিয়মগুলির সব সভ্যতার ক্ষেত্রেই অনুসরণ করা হয়েছিল।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম পর্ব ঃ লৌহযুগ

প্রথম পাঠ ঃ লোহার আবিষ্কার ও ব্যবহার

মানুষের সভ্যতা তার হাতিয়ার ও হাতিয়ার ব্যবহারের দক্ষতার ওপর কতখানি নির্ভর করে তা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। আমরা এর আগে দেখেছি যে প্রাচীনতম কালে মানুষ পাথরের তৈরী হাতিয়ার নিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে। পাথরের তৈরী কুড়াল, কাটারি, ছুরি প্রভৃতি হাতিয়ার নিয়ে সে পশু শিকার করেছে, বন-বাদাড়ের মধ্যে ফাঁকা জায়গায় বা পাহাড়ের ঢালু গায়ে অল্প অল্প চাষবাস করছে, কিন্তু এইভাবে খাদ্য উৎপাদন করে সে খুব বেশী উন্নতি করতে পারেনি। তারপর এল তামা ও ব্রোঞ্জের হাতিয়ার। এইসব ধাতুর ব্যবহার মানুষকে সভ্যতার পথে এগিয়ে যেতে অনেকখানি সাহায্য করেছে। এই ধাতুর হাতিয়ার দিয়ে সে বনজঙ্গল কেটে ফেলে চাষের জমি বাড়িয়েছে, ঘরবাড়ি তৈরী করেছে, কাঠের তৈরী বড় বড় নৌকা বানিয়েছে। ব্রোঞ্জের তৈরী হাতিয়ার দিয়ে—মানুষ কত উন্নতি করেছিল তার পরিচয় আমরা ভারতের সিন্ধু-সভ্যতা, মেসোপটেমিয়ার সুমেরীয় সভ্যতা বা প্রাচীন মিশরের সভ্যতার ইতিহাস পড়তে গিয়ে জেনেছি। কিন্তু ব্রোঞ্জ খুব শক্ত ধাতু নয় সেই কারণে ব্রোঞ্জের তৈরী অস্ত্র-শস্ত্র বা হাতিয়ার দিয়ে খুব বড় ও শক্ত গাছের জঙ্গল কেটে ফেলা সম্ভব ছিল না বা ব্রোঞ্জের তৈরী লাঙ্গলের ফলা দিয়ে খুব শক্ত মাটিতে চাষ করা যেত না, ফলে মানুষের খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা কিছুটা উন্নত হলেও মানুষের প্রয়োজনের তুলনায় তা যথেষ্ট হল না। তখন মানুষ আরো শক্ত আরো মজবুত ধাতুর সন্ধান শুরু করল যা দিয়ে যে কোন শক্ত গাছ কেটে ফেলা যায় বা শক্ত মাটিতে লাঙ্গল চালান যায়। এই ধাতুর খোঁজ করতে গিয়ে মানুষ খুজে পেল লোহা যা ব্রোঞ্জের চেয়ে

অনেক বেশী শক্ত বা যা সহজেই বড় বড় গাছ কেটে ফেলতে পারে বা যার ফলা দিয়ে যে কোন রকম শক্ত মাটিতে চাষ দেওয়া যায়। লোহার সন্ধান পেয়ে মানুষ ব্রোঞ্জের জায়গায় লোহার তৈরী হাতিয়ার ব্যবহার শুরু করল এবং আরম্ভ হল মানব সভ্যতার লৌহযুগ। এখনও এই যুগই চলছে।

প্রাচীন যুগের মানুষ লোহার ব্যবহার কিছু কিছু জানত কিন্তু লোহার আংটি, তাবিজ, বালা, মালা প্রভৃতি অলঙ্কার পরা ছাড়া আর কিছুই জানত না। এই লোহা তারা সংগ্রহ করত আকাশ থেকে পড়া উল্কার টুকরো থেকে, মাটি খুঁড়ে নয় এবং তার পরিমাণও খুব অল্প। তাই লৌহযুগে লোহাকে সোনার চেয়েও মূল্যবান মনে করা হ'ত এবং রাজা-রাণীরা লোহার তৈরী মালা বা বালা পরতে গর্ববোধ করত। যাই হোক মাটি খুঁড়ে লোহা বের করে এবং তা আগুনে গালিয়ে লোহার হাতিয়ার তৈরী আরম্ভ হয় আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০০ অব্দ থেকে। এশিয়া মাইনরের পূর্বপ্রান্তে বাস করত হিট্টাইটরা, তারাই লোহা গালাবার নিয়ম ও লোহার তৈরী হাতিয়ার ব্যবহারের প্রচলন করে। তাদের কাছ থেকে মিশর ও পরে মধ্য এশিয়ার অন্যান্য জাতি লোহার ব্যবহার শিক্ষা করে।

দ্বিতীয় পাঠ : সামাজিক ও অর্থ নৈতিক বৈশিষ্ট্য

ক্রমবর্ধমান রাজশক্তি

তামা ও ব্রোঞ্জ খুব অল্পই পাওয়া যায় এবং এই ধাতুগুলো বেশ মূল্যবান। বড় লোকেরাই শুধু এই সব ধাতুর হাতিয়ায় ব্যবহার করত। ফলে তারাই ছিল খুব শক্তিশালী। সমাজে সাধারণ কৃষক ও শিল্পীদের কোন ক্ষমতাই ছিল না। লোহা কিন্তু অনেক সহজে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং দামেও খুব সস্তা, তাই যন্ত্রপাতির জন্যে আর তাদের ধনী পুরোহিত বা রাজার মুখ চেয়ে থাকতে হ'ত না। গরীব শিল্পী ও

কৃষকরাও নিজেদের প্রয়োজনীয় হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতি নিজেরাই খুব অল্প দামে সংগ্রহ করতে পারত। এর ফলে বনজঙ্গল সাফ করে তারা নতুন নতুন চাষের জমি বাড়াতে লাগল এবং তাদের প্রয়োজনীয় হাতিয়ারগুলো কামার, ছুতোর প্রভৃতি কারিগররা তৈরী করে বেশ দু' পয়সা উপার্জন করা শুরু করল। তার ফলে সমাজে এইসব কৃষক ও কারিগরী শিল্পীদের সামাজিক ও বৈষয়িক অবস্থা বেশ কিছুটা উন্নত হ'ল।

ব্রোঞ্জের যুগে রাজারা বড় লোকদের সাহায্য ছাড়া চলতে পারত না। যুদ্ধ বাধলে ধনী পুরোহিত বা বড়লোকরাই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রাজাকে সাহায্য করত। তাই রাজারাও এই সব ধনীলোকদের সঙ্গে ঝগড়া করতে চাইত না। এর পর যখন লোহা বা ইস্পাতের তৈরী তরোয়াল, কুঠার, বর্শা প্রভৃতির প্রচলন হল তখন রাজারা লোহা সহজে পাওয়া যায় বলে, সাধারণ কৃষক ও কারিগরদের দিয়ে সৈন্যদল তৈরী করে তাদের হাতে লোহার অস্ত্র দিয়ে নিজস্ব সৈন্যদল তৈরী করলেন। রাজাদের আর ধনী পুরোহিত বা বড়লোকদের ওপর খুব বেশী নির্ভর করতে হল না এবং আস্তে আস্তে রাজার ক্ষমতা বেড়ে গেল।

দ্বিতীয় পর্ব ঃ ব্যাবিলনের সভ্যতা

প্রথম পাঠ ঃ কৃষি ও বাণিজ্য / মন্দির ও পুরোহিত

তাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর জলে পুষ্ট মেসোপটেমিয়া দেশ। এখানে অনেকগুলো যাযাবর দল বাস করত। এরা ছিল সেমেটিক জাতের লোক। এরা সমস্ত মেসোপটেমিয়া জয় করে একটা বিরাট রাজ্য স্থাপন করে। ইউফ্রেটিস নদীর তীরে ব্যাবিলন ছিল এদের রাজধানী। রাজধানীর নামে রাজ্যের নাম হয় ব্যাবিলন। ঐতিহাসিকেরা এই রাজ্যের সভ্যতার নাম দিয়েছেন ব্যাবিলনের সভ্যতা।

প্রাচীন কালে মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণ অংশকে বলা হত সুমের। সুমের দেশটা ছিল জলা। নীচু জমিতে বারো মাস জল জমে থাকত। সুমেরবাসীরা খাল কেটে, নদীতে বাঁধ বেঁধে দেশটাকে চাষের উপযুক্ত করল। কৃষিই ছিল মেসোপটেমিয়া বা সুমেরের প্রধান সম্পদ। সুমেরীয়রা তথা ব্যাবিলনীয়রা কৃষির উন্নতির জন্য সব সময় চেষ্টা করত। দেশের ভেতর খাল ও বাঁধগুলোকে খুব যত্ন করে রক্ষা করত। তাছাড়া গরু, গাধা, ছাগল, ভেড়া পুষত। ব্যাবিলনের সম্পদ দেখে অনেক নতুন নতুন জাত এখানে এসে বাস করতে শুরু করে কিন্তু তাদের খাদ্যের অভাব হয়নি।

ব্যাবিলনের সম্পদ বাড়াবার আর একটা উপায় ছিল ব্যবসা বাণিজ্য। ব্যাবিলনের অধিবাসীরা জলপথে স্থলপথে ব্যবসা বাণিজ্য করত। বণিকেরা দল বেঁধে গাধার পিঠে মালপত্র চাপিয়ে অন্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যে বের হ'ত। সিন্ধু উপত্যকার লোকেদের সঙ্গেও তারা জল পথে ব্যবসা বাণিজ্য করত। ব্যাবিলনের তৈরী পশমী কাপড় আর মূল্যবান পাথরে তৈরী অলঙ্কারের খুব খ্যাতি ছিল এবং ব্যবসার বড় কেন্দ্র হিসাবে ব্যাবিলন নগরও খুব বিখ্যাত ছিল।

ব্যাবিলনবাসীরা অনেক বড় বড় মন্দির তৈরী করেছিল। এদের মধ্যে ধর্মের প্রভাব ছিল খুব বেশী এবং এরা বহু দেবদেবীর পূজা

করত। অনেক দেবদেবীর মধ্যে মারডুক ও ইষ্টারই ছিল প্রধান। মারডুক ছিলেন ব্যাবিলনের নগর দেবতা। দেবীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ইষ্টার।

সমাজে পুরোহিতরা খুব শক্তিশালী ছিলেন। স্বয়ং রাজারাও তদের ভয় করে চলতেন। এরা পূজা ও বলি দিয়ে দেবদেবীর তুষ্টি সাধন করতেন। গ্রহ নক্ষত্র দেখে ভবিষ্যদ্‌বাণী করতেন। পুরোহিতেরা মন্দিরে জমান অর্থ দিয়ে মহাজনী কারবারও চালাতেন।

দ্বিতীয় পাঠ : বিদ্যাচর্চা ও সংস্কৃতি

ব্যাবিলনবাসীরা কিউনিফর্ম বা তীরমুখো লিপি দিয়ে লিখত। এরা নরম কাদামাটির ফলক তৈরী করে তার ওপর কাঠের কলম দিয়ে লিখত। লেখা শেষ হলে কাঠি দিয়ে ঘষে মুছে দিত। তখন অনেক বিদ্যালয় ছিল। কিভাবে লিখতে হয় ছাত্রদের তা বিশেষভাবে শেখান হত। পুরোহিতেরা জ্যোতিষ চর্চা করতেন। পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতির চর্চা হ'ত। শিক্ষিত লোকেরা কবিতা পড়তে ভালবাসত। গিল-গমেস্ নামে একজন বিখ্যাত বীরের কথা দিয়ে একটা মহাকাব্য লেখা হয়েছিল। ব্যাবিলনেই পৃথিবীর সর্বপ্রথম পাঠাগার স্থাপিত হয়। সেখানে মাটির ফলকে লেখা বিভিন্ন গ্রন্থ রাখা হত। ঐ ফলকগুলোকে আগুনে পুড়িয়ে শক্ত করা হত।

তৃতীয় পাঠ : হামুরাবির আইন-সংহিতা ও সামাজিক অবস্থা

ব্যাবিলনের রাজাদের মধ্যে খুব বিখ্যাত ছিলেন হামুরাবি। তিনি সমস্ত মেসোপটেমিয়ার ওপর রাজত্ব করতেন। তিনি রাজ্যের জন্য অনেকগুলি আইন প্রণয়ন করেন। তারপর দেশের প্রচলিত আইন-গুলি সংগ্রহ করে একটা পাথরের থামে খোদাই করে রাখেন। সবাই তা পড়তে পারত, ফলে বিচারকেরা যেমন খুসী বিচার করতে পারত না।

হামুরাবির আইন খুবই কঠোর ছিল। কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে বিশেষতঃ বিধবা ও দরিদ্র ব্যক্তিরা যাতে সুবিচার পায় সেদিকে রাজার দৃষ্টি ছিল।

হামুরাবি ব্যাবিলনের অধিবাসীদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন। প্রথম শ্রেণীতে ছিল অভিজাত বংশের লোক, যোদ্ধা এবং রাজকর্মচারী। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিল চাষী, শিল্পী ও বণিক। সব শেষে ছিল ক্রীতদাস শ্রেণী। আইনের চোখে ঐ তিন শ্রেণীর লোকের মান মর্যাদা ও অধিকার ছিল ভিন্ন ভিন্ন। যদি কেউ অপরাধ করত, তা হলে সে কোন শ্রেণীর লোক তাই দেখে তাকে শাস্তি দেওয়া হত। মোটামুটি ওপরের শ্রেণীর লোকেরা অনেক বেশী অধিকার ও সুবিধা ভোগ করত। সে যুগের রাজকর্মচারীরা একালের মতই ঘুষ নিত এবং হামুরাবি তাদের শাস্তি দিবার নির্দেশও দিয়ে গেছেন।

হামুরাবি

Half yearly
Exam

তৃতীয় পর্ব ॥ মিশরীয় সাম্রাজ্য

প্রথম পাঠ : সাম্রাজ্য বিস্তার

প্রথম যুগে মিশর দেশে শান্তির অভাব ছিল না। পরে ফ্যারাওদের শক্তি দুর্বল হয়ে যায়। দুর্বল ফ্যারাওদের রাজত্বকালে বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তারা ক্ষমতা দখলের জন্যে পরস্পরের সঙ্গে মারামারি-কাটাকাটি শুরু করে দেয়। এই অরাজকতার সময়ে পশ্চিম এসিয়া থেকে হিকসস্ নামে সেমেটিক জাতের এক শাখা মিশর দখল করে নেয়। ঘোড়ায় টানা রথে চড়ে এরা মিশর আক্রমণ করে। মিশরবাসীরা এর আগে ঘোড়া দেখেনি, রথে চেপে যুদ্ধ করার কৌশলও মিশরবাসীরা জানত না, আর ফ্যারাওরাও দুর্বল হয়ে পড়েছিল, ফলে সহজেই হিকসস্‌রা মিশর জয় করে নেয়।

হিকসস্‌দের রাজত্ব প্রায় দুশো বছর স্থায়ী হয়েছিল। এরপর মিশরীয়রা হিকসস্‌দের কাছ থেকে ঘোড়ায় টানা রথে চড়ে যুদ্ধ করার কৌশল শিখে নেয় এবং অবিরাম যুদ্ধ করে হিকসস্‌দের তাড়িয়ে দেয়। দক্ষিণ মিশরের থীব্‌স নগরের সামন্ত রাজা আহমোস্ বিদ্রোহী মিশরবাসীদের নেতৃত্ব দেয় এবং স্বাধীন মিশরের একটি শক্তিশালী রাজবংশ গড়ে তোলে।

এই সময় থেকে মিশরের জীবনে একটি বিরাট পরিবর্তন এল। এতদিন মিশরবাসীরা ছিল শান্তিপ্রিয়, এবার তারা যুদ্ধপ্রিয় হয়ে উঠল। আহমস ও তার বংশধররা মিশরবাসীদের এই যুদ্ধপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে রাজ্য বিস্তারে মন দিল। প্রথমেই তারা হিকসস্‌দের দেশ সীরিয়া ও প্যালেষ্টাইন আক্রমণ করল। মিশরের কাছাকাছি অঞ্চলে কোন শক্তিশালী রাজ্য ছিল না, ফলে ফ্যারাওরা সহজেই এসিয়ার পশ্চিম অংশে সাম্রাজ্য বিস্তার করে ফেলল।

আহমোসের বংশধর তৃতীয় থাটমস এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে

তৃতীয় থাটমস

ভূ-মধ্য সাগরের পূর্ব উপকূলে ফিনিসীয় ও আরব নগরগুলি জয় করলেন। এইভাবে ইউফ্রেটিস নদীর তীর পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল ফ্যারাওদের পদানত হল। তাছাড়া একটা শক্তিশালী রণতরী বাহিনী তৈরী করে ভূমধ্য-সাগরের অনেকগুলো দ্বীপ অধিকার করলেন। পরে সুদান রাজ্যও জয় করা হল। এইভাবে মিশরবাসীরা একটা বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলল।

পরাধীন দেশগুলোকে শাসন করার জন্যে ফ্যারাওরা সেখানকার শহরগুলোতে মিশরীয় সৈন্য রাখত। এখানকার শাসনকার্য চলত মিশরবাসী কর্মচারী দিয়ে। ঐসব উপনিবেশ থেকে মিশরে প্রচুর ধন-সম্পদ কর হিসাবে পাঠান হত। মিশরের এই সাম্রাজ্য প্রায় চারশো বছর টিকেছিল।

দ্বিতীয় পাঠ : পুরোহিতদের ক্ষমতা

মিশরবাসীরা বহু দেব দেবীর পূজা করত। এক এক অঞ্চলে ছিল এক এক দেবতার প্রভাব। আহমস্ বংশের রাজধানী থীব্স নগরের দেবতা ছিলেন আমন। রাজারা তাঁকে জাগ্রত দেবতা বলে মনে করতেন। তাঁরা ভাবতেন আমনের আশীর্বাদেই তারা হিকসস্‌দের তাড়াতে পেরেছে। তাই তারা আমনের মন্দিরটাকে খুব সুন্দর করে তৈরী করান এবং তাঁর পূজার জন্য অনেক ধন সম্পত্তি ও জমিজমা দান করেন। মিশরে এই সময় আরো অনেক দেব দেবীর পূজা হত। ওসিরিস্, সেট, হোরাস, দেবী আইসিস প্রভৃতি দেব দেবীও খুব জনপ্রিয় ছিলেন কিন্তু

আমন ছিলেন সকলের ওপরে। মিশরের অন্যান্য শহরেও আমন দেবতার মন্দির তৈরী হ'ত। তখন থীব্‌স নগরীর আমন দেবতার
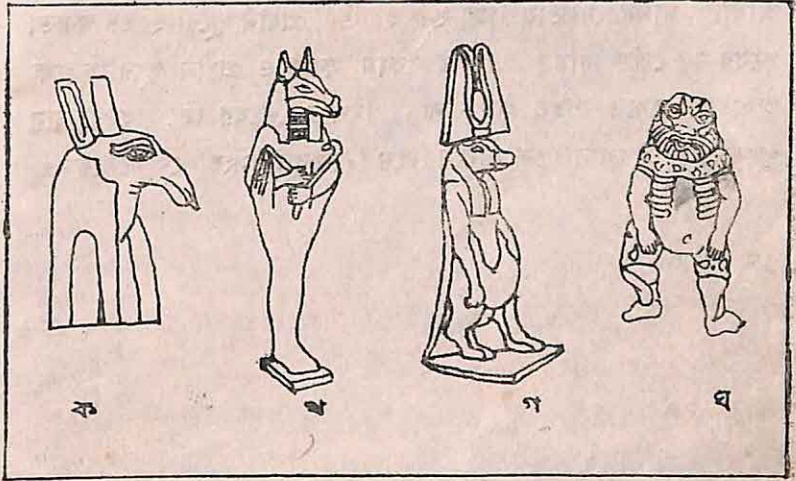
মিশরের দেবদেবী

মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন মিশরের প্রধান পুরোহিত। আমন দেবতার মন্দিরে ধন-সম্পদ বেড়েই চলছিল, সেই সমস্ত দেখা শোনা করার জন্য অনেক কর্মচারী ও পুরোহিত নিযুক্ত হত। এরা সবাই প্রধান পুরোহিতের নির্দেশ মেনে চলত ধীরে ধীরে প্রধান পুরোহিতের প্রভাব ও ক্ষমতা এত বেড়ে গেল যে ফ্যারাওরাও তাঁকে অবহেলা করতে পারত না।

ফ্যারাও ইখ্‌নাটন

আমনের প্রধান পুরোহিতের ক্ষমতা খর্ব করার জন্য ফ্যারাও ইখ্‌নাটন নানা দেবতার পরিবর্তে এক

সূর্য দেবতার পূজা প্রচলন করার চেষ্টা করেন। তাঁর নির্দেশে সকল মন্দির হতে আমনের নাম মুছে ফেলা হয়। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরেই আবার আমন দেবতার পূজা শুরু হয় এবং প্রধান পুরোহিতের ক্ষমতা পূর্বের মত বেড়ে যায়। এরপর কোন ফ্যারাও প্রধান পুরোহিতকে অবহেলা করতে সাহস করত না। মিশরে শেষের দিকে দেখা যায় পুরোহিতরাই ফ্যারাওকে সরিয়ে দিয়ে নিজেরাই সিংহাসনে বসেছেন।

চতুর্থ পর্ব ॥ পারস্য

প্রথম পাঠ ঃ পারসিক জাতির অভ্যুদয়

আর্যজাতির একটি শাখা পারস্য বা ইরাণে এসে বসবাস শুরু করে। তাদের একটি দল ভারতবর্ষে চলে আসে। প্রাচীন পারসিক ভাষা ও সংস্কৃত ভাষার মধ্যে তাই বেশ মিল ছিল দেখা যায়। ভারতের বৈদিক দেব-দেবীর নামের সঙ্গেও প্রাচীন পারসিক দেব-দেবীর নামের মিল রয়েছে। 'ম্যাজি' নামে পুরোহিতদের ক্ষমতাও ছিল ভারতের ব্রাহ্মণদের মত।

মীড নামে আর্যজাতির একটা শাখা পারস্য দেশে সর্বপ্রথম একটা শক্তিশালী রাজ্য গড়ে তোলে। তাদের হারিয়ে পারসিকদের রাজা
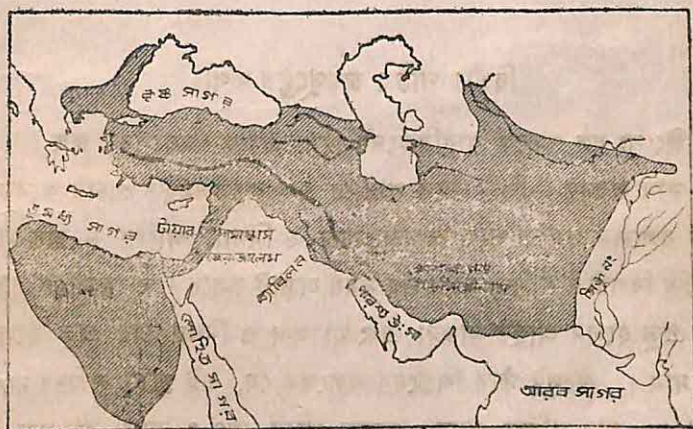
পারসিক সাম্রাজ্য

সাইরাস পারসিক সাম্রাজ্য স্থাপন করলেন। এরপর সাইরাস পশ্চিম এসিয়ার অনেক দেশ জয় করেন। ব্যাবিলনও তিনি অধিকার করেন। আস্তে আস্তে ভূ-মধ্য সাগরের পূর্বতীর থেকে আরম্ভ করে ভারতের গান্ধার পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল জয় করে এক বিশাল সাম্রাজ্য গঠন

করেন। পার্সিপোলিস নগরীতে তিনি নতুন রাজধানী স্থাপন করলেন। সাইরাসের ছেলে ক্যামবাইসিসও খুব বিখ্যাত সম্রাট ছিলেন।

ক্যামবাইসিসের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যের মধ্যে খুব গোলযোগ দেখা দেয়। তখন ক্যামবাইসিসের আত্মীয় দারায়ুস শক্ত হাতে সমস্ত গণ্ডগোল দমন করে নিজেই সম্রাটের পদ দখল করলেন। দারায়ুস তাঁর সাম্রাজ্য আরো বাড়ালেন। তিনি ইউরোপের দানিয়ুব নদী পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেন। ভারতের পশ্চিমদিকের সিন্ধু, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলও তিনি দখল করেন।

রাজত্বের শেষ দিকে দারায়ুস গ্রীস জয় করার চেষ্টা করেন, কিন্তু গ্রীকদের বীরত্বের জন্য তিনি সফল হননি। তাঁর পুত্র জার্কসিজও গ্রীস দখল করার চেষ্টা করে বিফল হন। গ্রীকদের কাছে পরাজিত হলেও পশ্চিম এসিয়ায় পারসিকদের সাম্রাজ্য বহুদিন অটুট ছিল।

দ্বিতীয় পাঠ ঃ জরথুষ্ট্রের কথা

খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে পারসিকদের মধ্যে একজন মহাপুরুষ জন্ম নেন। তাঁর নাম জরথুষ্ট্র। তিনি এসে পারস্যে এক নতুন ধর্মমত প্রচার করেন। তিনি বললেন জগতে ভাল ও মন্দ, সত্য ও মিথ্যা, আলো ও অন্ধকার প্রভৃতি বিপরীত শক্তির মধ্যে সব সময় লড়াই চলছে। যা ভাল ও সত্য তাঁর প্রভু হলেন আহুর-মাজদা এবং যা মন্দ ও মিথ্যা তার প্রভু হলেন আর্হিমান। জরথুষ্ট্র তাঁর শিষ্যদের বলতেন যে, এই দুটো শক্তির মধ্যে তারা যে কোন শক্তির পূজো করতে পারে অর্থাৎ ভাল বা মন্দ যে কোন ভাবেই তারা জীবন যাপন করতে পারে কিন্তু পরলোকে তাদের কাজের জন্যে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। জরথুষ্ট্রের উপদেশগুলো সংগ্রহ করে অবেস্তা নাবে একখানা গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এই গ্রন্থটি পারসিকদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ।

পারসিকদের মৃতদেহ সৎকারের প্রথা সম্পূর্ণ নতুন ধরণের। তারা

মৃতদেহ আগুনে পোড়ায় না, জলে ভাসিয়ে দেয় না, মাটিতে কবরও দেয় না। লোকালয় থেকে দূরে উঁচু প্রাচীর ঘেরা প্রাঙ্গনে মৃতদেহ ফেলে দেওয়া হয়। শকুন, চিল প্রভৃতি পাখীরা সেই মৃতদেহ খেয়ে ফেলে। মৃতদেহ সংকারের এই প্রাঙ্গনকে ইংরাজীতে বলে "টাওয়ার-অব-সাইলেন্স"।

প্রাচীন পারসিক ধর্মের লোকেরা পৃথিবীতে আর নাই বললেই চলে শুধু ভারতবর্ষের বোম্বাই অঞ্চলে কিছু কিছু প্রাচীন পারসিক ধর্মের লোক দেখা যায়।
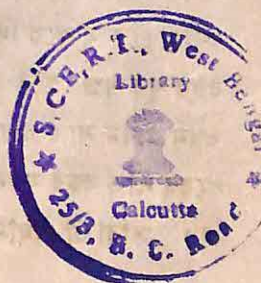
পঞ্চম পর্ব ।। ইহুদী জাতি

প্রথম পাঠ ঃ মিশরবাসী ইহুদীদের কাহিনী

খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের প্রথম অংশের নাম "ওল্ড টেষ্টামেন্ট"। এই গ্রন্থ থেকে ইহুদীদের অনেক প্রাচীন কাহিনী জানা যায়। তারা প্রথমে ছিল যাযাবর। এদের একটা দল ব্যাবিলনের 'উর' নগরে এসে বাস করতে থাকে। তাদের নেতা ছিল আব্রাহাম। ইহুদীরা আব্রাহামকে তাদের আদি পুরুষ বলে মনে করে। তাঁর বংশধররা দক্ষিণ প্যালেষ্টাইনে এসে স্থায়িভাবে বাস করতে শুরু করে। এর পর আবার তারা বাসভূমি পরিবর্তন করে মিশরে বাস করতে যায়।

ইহুদীদের মিশরে আসা নিয়ে একটা সুন্দর গল্প আছে। আব্রাহামের নাতি জেকবের বারজন ছেলে ছিল। এদের মধ্যে যোশেফকেই জেকব বেশী ভালবাসতেন তাই হিংসা করে অন্যান্য ভাইরা যোশেফকে মিশরীয় বণিকের কাছে বিক্রী করে দেয়। মিশরে যোশেফ বহু বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর প্রভুও তাকে ভালবাসতেন। যোশেফের জ্ঞানের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই সময় মিশরের রাজা ফ্যারাও একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেন। তিনি দেখলেন সাতটা হৃষ্টপুষ্ট গরু নদীর ধারে চরছে, তারপর সাতটা দুর্বল গরু উঠে এসে ঐ সাতটা হৃষ্টপুষ্ট গরুকে খেয়ে ফেলল। ফ্যারাও স্বপ্নের অর্থ জানবার জন্য পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করলেন কিন্তু কেউ তার অর্থ বলতে পারল না। তখন যোশেফের ডাক পড়ল। তিনি ফ্যারাওকে বুঝিয়ে দিলেন যে তার স্বপ্নের অর্থ হল যে, মিশরে সাত বছর খুব শস্য হবে কিন্তু পরের সাত বছর দুর্ভিক্ষ হবে। ফ্যারাও তখন প্রথম সাত বছরের কিছুটা শস্য জমিয়ে রাখার আদেশ দিলেন। পরের সাত বছর যখন দুর্ভিক্ষ হল, তখন মিশরবাসীদের কোন ক্ষতি হল না। তারা ঐ জমান শস্য খেয়ে দুর্ভিক্ষের বছরগুলো পার হয়ে গেল।

এর পর যোশেফের রাজদরবারে খুব প্রতিপত্তি বাড়ল। পরে দক্ষিণ প্যালেষ্টাইনে যখন দুর্ভিক্ষ হল, তখন যোশেফের ভাইরা শস্য কেনার জন্য মিশরে এল। যোশেফ তাদের দেখে খুব আনন্দিত হলেন এবং তাদের অপরাধ ক্ষমা করে তাদের সবাইকে মিশরে এসে বসবাস করতে বললেন। এবভাবে ইহুদীরা স্বদেশ ছেড়ে মিশরে এসে বাস করতে শুরু করে।

ইহুদীরা যখন মিশরে আসে তখন হিকসস্‌রা মিশরে রাজত্ব করছিল। ইহুদীরা এই হিকসস্‌দের প্রিয়পাত্র ছিল। পরে যখন হিকসস্‌রা বিতাড়িত হল, তখন মিশরীয় ফ্যারাওরা চরম অত্যাচার শুরু করে দেয় ইহুদীদের ওপর। তারা ইহুদীদের ক্রীতদাসের মত কাজ করিয়ে নিত।

দ্বিতীয় পাঠঃ মোজেস

এই সময় ইহুদীদের মধ্যে একজন মহাপুরুষের জন্ম হয়। তাঁর নাম মোজেস। তিনি ইহুদীদের দেবতা জিহোভার প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে ইহুদীরা মিশর ছেড়ে পালিয়ে যায়। মোজেস ইহুদীদের নিয়ে লোহিত সাগরের তীরে এসে উপস্থিত হলেন। এদিকে ফ্যারাও ইহুদীদের পালিয়ে যাওয়া বন্ধ করার জন্যে বিরাট একদল সৈন্য পাঠালেন। ইহুদীরা খুব বিপদে পড়ল, সামনে লোহিত সাগর, পিছনে ফ্যারাওএর সৈন্য। কিন্তু মোজেস ভয় পেলেন না। তিনি দৈবশক্তিতে বলীয়ান। তিনি তাঁর একখানি হাত জলের ওপর রাখতেই সমুদ্র দুভাগ হয়ে পথ করে দিল। ইহুদীরা সেইপথে সমুদ্র পার হয়ে গেল। এর পর যখন ফ্যারাওএর সৈন্যদল সেই পথের মাঝামাঝি এসেছে, তখন সমুদ্র আবার এক হয়ে গেল এবং ফ্যারাওএর সৈন্যদল ধ্বংস হল। এইভাবে মোজেস ইহুদীদের ফ্যারাওএর দাসত্ব থেকে মুক্ত করলেন।

দীর্ঘকাল মরুভূমিতে ঘুরে মোজেস সিনাই পর্বতে এসে উপস্থিত হলেন। এইখানে মোজেস ঈশ্বর জিহোভার আদেশ ইহুদীদের শোনালেন। এই আদেশগুলো হল—(ক) ইহুদীরা জিহোভা ছাড়া অন্য কোন দেবতার পূজা করবে না। (খ) নরহত্যা করবে না। (গ) লোভ করবে না। (ঘ) মা বাবাকে ভক্তি করবে। (ঙ) পবিত্র জীবন যাপন করবে। (চ) চুরি করবে না। (ছ) মূর্তি পূজা করবে না। (জ) ভগবানের নামে অযথা শপথ করবে না। (ঝ) মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না। (ঞ) মেয়েদের সম্মান করবে।

মোজেসের মৃত্যুর পর ইহুদীরা প্যালেষ্টাইনে গিয়ে নিজেদের স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিল।

ষষ্ঠ পর্ব ।। গ্রীসের কথা

প্রথম পাঠ : ক্রীট দ্বীপের সভ্যতা

আর্যদের একটি শাখা ইউরোপের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাচীন গ্রীক, রোমান, জার্মান প্রভৃতি জাতি তাদেরই বংশধর। প্রাচীন গ্রীকরাই ছিল ইউরোপীয় সভ্যতার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কিন্তু গ্রীক সভ্যতা অনেক ভাবেই ক্রীট দ্বীপের সভ্যতার কাছে ঋণী।

ক্রীট দ্বীপের প্রাচীন অধিবাসীরা গ্রীক ছিল না। প্রায় ৪০০০ খ্রীঃ পূঃ অব্দে ক্রীটবাসীরা তাদের সভ্যতা গড়ে তোলে। সেখানকার একজন পৌরাণিক রাজার নামে ঐতিহাসিকরা এই সভ্যতার নাম দিয়েছেন মিনোয়ান সভ্যতা। এরা ধাতুর ব্যবহার জানত। তারা সুন্দর সুন্দর নগরী তৈরী করেছিল। সে সব নগরীতে জল নিকাশের ভাল ব্যবস্থা ছিল। ক্রীটবাসীরা মাটির পাত্র তৈরী, সোনা-রূপোর অলঙ্কার তৈরী, স্থাপত্য বিদ্যায় ও ছবি আঁকায় খুব দক্ষতা অর্জন করেছিল। ক্রীটের প্রাকৃতিক সম্পদ প্রায় বিশেষ কিছুই ছিল না, তাই প্রথম থেকেই এরা ব্যবসা বাণিজ্য করে জীবন যাপন করত। ক্রীট রাজ্যের রাজধানীর নাম ক্নোসস্।

দক্ষিণ গ্রীসের মাইসিন শহর ক্রীটবাসীদের একটা বড় বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। এখানকার অধিবাসীরা এক সময় খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং ক্রীট রাজ্যের রাজধানী ক্নোসস্ ধ্বংস করে ক্রীট সাম্রাজ্যের পতন ঘটায়। এখানকার লোকেরা গ্রীক ভাষায় কথা বলত কিন্তু মিনোয়ান লিপিতে লিখত। মিনোয়ানদের কাছ থেকে এরা তাদের শিল্পরীতি শিখে নিয়ে মাইসিনিতে ক্রীটের মত বড় বড় প্রাসাদ তৈরী করে। এক হিসাবে এরা ক্রীট সাম্রাজ্যের পতন ঘটালেও ক্রীট সভ্যতা বাঁচিয়ে রাখে। কিছুদিন পরে গ্রীক জাতির আর একটা শাখা উত্তরদিক থেকে গ্রীসে প্রবেশ করে মাইসিনি সভ্যতা ধ্বংস করে দেয়। এর পর গ্রীকরাই গ্রীসে ছোট ছোট রাজ্য গড়ে তোলে।

দ্বিতীয় পাঠ : হোমারের যুগ

গ্রীকরা লিখতে জানত না কিন্তু তাদের পূর্ব পুরুষের কথা কাহিনী-গুলো তাদের মুখে মুখে গল্পের আকারে বেঁচে ছিল। তারপর যখন গ্রীকরা লিখতে শিখল তখন কবিরা ঐ সব মুখে মুখে চলে আসা গল্পগুলো নিয়ে ভাল ভাল কবিতা লিখল। ঐ সব কবিদের মধ্যে খুব বিখ্যাত ছিলেন হোমার। তিনি দুখানি মহাকাব্য লেখেন, একখানির নাম 'ইলিয়াড' আর অপরটির নাম 'ওডিসি'। কিভাবে গ্রীকদেশের বীররা একসঙ্গে মিলে এসিয়া মাইনরের ট্রয় নগরটি ধ্বংস করেছিলেন তারই বিবরণ আছে ইলিয়াড মহাকাব্যে। আর কি করে মহাবীর ওডিসিউস্ ট্রয় থেকে ফেরার পথে নানা রকম বিপদ-আপদ কাটিয়ে দেশে ফিরে ছিলেন তারই বৃত্তান্ত রয়েছে ওডিসি মহাকাব্যে। ইলিয়াড ও ওডিসি মহাকাব্যে যে সব যুদ্ধ ও দুঃসাহসিক কাজের কথা বর্ণনা করা হয়েছে তা হল মিনোয়ান সভ্যতার সঙ্গে গ্রীক সভ্যতার যুদ্ধের কাহিনী।

হোমার

হোমারের কাব্য থেকে জানা যায় যে তারা লিখতে জানত না। নাগরিক জীবনের সঙ্গেও তাদের পরিচয় ছিল না। তারা গ্রামে বাস করত এবং চাষচাস ও পশুপালন করে জীবন যাপন করত কিন্তু এরা লোহার ব্যবহার জানত। পরবর্তীকালে গ্রীকরা নগর তৈরী করেছিল এবং এক একটি নগর ও তার আশে পাশের জায়গা নিয়ে এক একটা রাজ্য স্থাপন করে। এরা সব সময় নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করত।

সেকালের গ্রীক রাজারা ছিলেন একাধারে রাজা, পুরোহিত, বিচারক ও সেনাপতি। নগরের বড় বড় লোকদের নিয়ে একটা সভা গড়া হত এবং রাজারা ঐ সভার মত নিয়ে কাজ করতেন।

এই মহাকাব্য দুখানি হতে প্রাচীন গ্রীকদের ধর্ম বিশ্বাসও জানা যায়। গ্রীস দেশের উত্তরে অলিম্পাস নামে একটা বিরাট পর্বত আছে। গ্রীকরা বিশ্বাস করত যে তাদের দেবতারা ঐ পর্বতে বসবাস করেন। দেবতাদের রাজা ছিলেন জিউস আর রাণী ছিলেন হেরা। গ্রীকরা জ্ঞানের দেবী এথেনা ও সূর্যের দেবতা অ্যাপোলো ও সমুদ্রের দেবতা পশিডনকে খুব শ্রদ্ধা ভক্তি করত। এছাড়া আরও অনেক দেব-দেবীর নাম মহাকাব্যে উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রীকরা দেবতাদের পূজা করতেন ভাল ফসল ও কাজে সাফল্যের জন্যে। খুব মজার কথা পাপ পুণ্য নিয়ে দেবতারা মাথা ঘামাতেন না। পুরোহিত বলে কোন বিশেষ শ্রেণী ছিল না। বাড়ীর কর্তাই পূজার কাজ চালাতেন এবং রাজারা সমস্ত প্রজার হয়ে পুরোহিতের কাজ করতেন।

এথেনা

তৃতীয় পাঠ ঃ গ্রীসের নগর রাষ্ট্র

আটশ খ্রীঃ পূঃ অব্দের কাছাকাছি গ্রীক গ্রামগুলো পরস্পর মিলে মিশে এক একটি নগর রাষ্ট্র তৈরী করল। গ্রীস দেশটা পাহাড় পর্বতে পূর্ণ। সেই সব পাহাড়ের উপত্যকায় এক একটি নগর রাষ্ট্রের জন্ম হল। এদের মধ্যে মেলামেশার খুব সুযোগ ছিল না, যাতায়াতের পথ ছিল কঠিন। তা ছাড়া তারা ছিল খুব স্বাধীনতা প্রিয়। ফলে মিশর বা ব্যাবিলনের মত এখানে কোন বড় সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে নাই। এই সব নগর রাষ্ট্র প্রথম দিকে রাজারাই শাসন করতেন। পরে জমির বড় বড় মালিকরা শাসন ব্যবস্থা দখল করে নেয় এবং তাদেরই নেতৃত্বে

প্রায় সব নগর রাষ্ট্রেই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু হয়। এই সব নগর রাষ্ট্রের মধ্যে খুব বিখ্যাত ও শক্তিশালী ছিল এথেন্স ও স্পার্টা।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গ্রীকদের মধ্যে কোন একতা ছিল না। কিন্তু তাদের মধ্যে একটা সুদৃঢ় সাংস্কৃতিক ঐক্য ছিল। গ্রীকরা মনে করত তারা একই পূর্বপুরুষের বংশধর। তাদের ভাষাও ছিল এক। হোমারের মহাকাব্য দুখানিকে তারা জাতীয় মহাকাব্য বলে শ্রদ্ধা করত। প্রত্যেক নগররাষ্ট্রে এই গ্রন্থগুলো আবৃত্তি করে শোনান হত। গ্রীকদের মেলামেশার আর একটা সুযোগ ছিল অলিম্পিক খেলা। অলিম্পিয়া শহরে দেবরাজ জিউসের একটা বিখ্যাত মন্দির ছিল। প্রতি চার বছর অন্তর সেখানে নানা রকম খেলাধুলা হত। গ্রীসের সমস্ত অঞ্চল থেকে খেলোয়াড়রা এখানে জড় হত এবং খেলাধুলায় অংশ গ্রহণ করত। নানা রাজ্য থেকে সাহিত্যিকরাও আসতেন এবং তাদের নতুন নতুন লেখা পড়ে শোনাতেন। এইভাবে খেলাধূলা ও সাহিত্য চর্চার মধ্য দিয়ে গ্রীসের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ গড়ে উঠত।

চতুর্থ পাঠ: উপনিবেশ বিস্তার

গ্রীকদের মধ্যে এক সময় রাজার সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে অভিজাত পরিবারের লোকেরা রাজ্যের কর্তা হয়ে বসে। ক্রমে তারা সব জমি জমাও দখল করে নেয়। অনেক সাধারণ লোক দেনার দায়ে তাদের জমিজমা বিক্রি করে দেয়, অনেকে আবার দেনা শোধ করতে না পেরে নিজেই ক্রীতদাস হয়ে যায়। এই সময় অনেক গ্রীক দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে অন্য জায়গায় জমিজমা সংগ্রহ করে বসবাস শুরু করে। এইভাবে গ্রীসের বাইরে উপনিবেশ গড়ে উঠতে থাকে। আবার অনেক লোক ব্যবসা বাণিজ্যের জন্যে স্থায়িভাবে বিদেশে চলে যায়। ক্রমে ক্রমে ইজিয়ান সাগরের সব দ্বীপগুলোতে, এশিয়া

মাইনরের উপকূলে, কাস্পিয়ান হ্রদের দক্ষিণে, ইটালি ও সিসিলিতে গ্রীকদের নতুন নতুন উপনিবেশ গড়ে ওঠে। এই উপনিবেশগুলো ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন, একমাত্র সাংস্কৃতিক বিষয় ছাড়া তাদের গ্রীসের সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ ছিল না।

পঞ্চম পাঠ : এথেন্স ও স্পার্টার জীবনযাত্রা

গ্রীক নগর-রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে এথেন্স ও স্পার্টাই ছিল প্রধান। প্রকৃত পক্ষে এই দুটো নগরীর ইতিহাসই গ্রীস দেশের ইতিহাসের বেশীর ভাগটাই দখল করে আছে।

এথেন্স : এথেন্সের সমাজে মোটামুটি তিন শ্রেণীর লোক বাস করত। সবচেয়ে ওপরে থাকত অভিজাত শ্রেণী। তারাই অধিকাংশ জমি জমার মালিক ছিল। তার নীচে ছিল কৃষক, শ্রমিক, কারিগর ও বনিকদের দল। বনিকদের মধ্যে কিছু কিছু লোক যথেষ্ট ধনী হয়ে উঠেছিল। সব থেকে নীচে ছিল দাস শ্রেণী। সমাজের বেশীর ভাগ কাজ দাস শ্রেণী ও কৃষক, কারিগর শ্রেণীর লোকদের করতে হত।

এথেন্স তার নাগরিকদের জন্য শিক্ষার ভাল ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। ছেলেদের ইতিহাস, গানবাজনা ও ছবি শেখার সঙ্গে সঙ্গে ব্যায়াম করতে শেখান হত। মেয়েদের শেখান হত ঘরের কাজকর্ম, গানবাজনা এবং একটু আধটু সেলাই এর কাজ। ষোল বছর বয়স হলেই ছেলেরা ব্যায়াম, কুস্তি ও খেলাধূলার ওপর জোর দিত। আঠার বছর বয়স হলে যুদ্ধ বিদ্যা ও শাসন পরিচালনার কাজ শিখত। তেইশ বছর বয়স হলে এথেন্সের যুবক নাগরিক অধিকার পেত এবং শাসন বিষয়ে অংশ গ্রহণ করত। দাস শ্রেণীর লোকেরা, মেয়েরা ও বিদেশী বাসিন্দারা নাগরিক অধিকার পেত না।

এথেন্সে গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক নাগরিককে শাসন ব্যাপারে সমান অধিকার দেওয়া ছিল। পৌরসভা বা পরিষদে গিয়ে

সরকারী কাজ করা, আইন তৈরী করা, বিচারের কাজে অংশ গ্রহণ করা প্রভৃতি কাজের সুযোগ সকলকে সমানভাবে দেওয়া হত।

স্পার্টা ঃ স্পার্টার সমাজে মোটামুটি দুই শ্রেণীর লোক বাস করত। নাগরিক শ্রেণী ও দাস শ্রেণী। এখানকার শাসন ব্যবস্থা ছিল কঠোর। এই নগরে দাসরা ছিল সংখ্যায় বেশী এবং তারা মনে মনে স্পার্টান নাগরিকদের ঘৃণা করত। তাদের দমন করার জন্য স্পার্টানরা খুব কঠোর শাসন ব্যবস্থা তৈরী করেছিল। স্পার্টায় শিক্ষা বলতে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষাই বোঝাত। সাত বছর বয়স হলেই ছেলেকে বাপ-মায়ের কাছ থেকে নিয়ে এসে সৈন্য আবাসে রাখা হত। তারপর রাজ্যের শাসন কর্তারা তাদের শিক্ষার ভার নিতেন। অসুস্থ ও বিকলাঙ্গ শিশুদের জন্মের পরেই মেরে ফেলা হত। ত্রিশ বছর বয়সে স্পার্টান যুবকরা বিয়ে করতে পেত, কিন্তু যাট বছর বয়স পর্যন্ত তাদের সৈন্য শিবিরে থাকতে হত। তারপরে তারা বাড়ীতে থাকবার অনুমতি পেত।

স্পার্টায় দু'জন রাজা থাকত, কিন্তু আসল রাজকার্য চালাত অভিজাত পরিবারের বৃদ্ধেরা। রাজারা শুধু যুদ্ধ পরিচালনা করতেন। সাধারণ লোক এবং দাসদের কোন অধিকার ছিল না। স্পার্টানরা ব্যবসা বাণিজ্য পছন্দ করত না। তারা ভাবত নতুন দেশ ও মানুষের সংস্পর্শে তাদের শাসন ও সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়তে পারে, তাই তারা কোন বিদেশীর সঙ্গে কোন রকম সম্পর্ক রাখত না। এর ফলে যুদ্ধ বিদ্যায় খুব দক্ষ হলেও শিক্ষা দীক্ষায় স্পার্টাবাসীরা খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। বিশ্বসভ্যতায় স্পার্টার কোন অবদান নেই বললেই চলে।

ষষ্ঠ পাঠ ঃ এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে দ্বন্দ্ব

পারসিকরা গ্রীস আক্রমণ করলে এথেন্স ও অন্যান্য গ্রীক রাজ্য স্পার্টানদের গ্রীক বাহিনী পরিচালনা করবার দায়িত্ব নিতে বলে। কিন্তু

স্পার্টানরা একটা উৎসবের কারণ দেখিয়ে পারসিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করতে ইতস্ততঃ করে। তখন এথেন্সবাসীরাই ঐ দায়িত্ব

ইজিয়ান জগৎ

নিজের কাঁধে তুলে নেয়। এথেন্সের কিছু দূরে ম্যারাথনের মাঠে পারস্য সম্রাট দারাউসের বিরাট বাহিনী এসে উপস্থিত হয়। এথেন্সবাসীরা সেই বিরাট বাহিনীকে হারিয়ে দিয়ে গ্রীসকে রক্ষা করল। এরপর সম্রাট দারাউসের ছেলে সম্রাট জার্কসিস হাজার হাজার সৈন্য নিয়ে গ্রীস আক্রমণ করল। এখন স্পার্টার রাজা লিওনিডাস মাত্র তিনশ স্পার্টান সৈন্য নিয়ে থার্মপলির গিরিপথে পারসিকদের বাধা দেন। যুদ্ধে লিওনিডাস হেরে যান, পারসিকরা এথেন্সে ঢুকে পড়ে এবং নগরটিকে পুড়িয়ে

লিওনিডাস

ছারখার করে দেয়। অবশ্য পারসিকদের এই সাফল্য স্থায়ী হয়নি। এথেন্সের নৌ-বাহিনী স্যালামিসের যুদ্ধে পারসিক নৌবহরকে ধ্বংস করে দেয়। স্যালামিসের যুদ্ধে হেরে গিয়ে জার্কসিস পারস্যে ফিরে গেলেন এবং গ্রীসদেশ পরাধীনতার হাত থেকে রক্ষা পেল।

পারসিকরা বিতাড়িত হলে স্পার্টানরা ঘরে ফিরে যায় কিন্তু এথেন্সবাসীরা এসিয়া মাইনর ও ইজিয়ান সাগরের গ্রীক উপনিবেশ-গুলোকে পারসিকদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য যুদ্ধ চালিয়ে গেল। ঐ সমস্ত অঞ্চলও এথেন্সের নেতৃত্বে মুক্ত হল।

পারসিকদের বিতাড়িত করে এথেন্স তখন ঐ সমস্ত গ্রীক উপনিবেশগুলোর কর্তা হয়ে বসল। এই সময় এথেন্সের নায়ক ছিলেন পেরিক্লিস। যাই হোক, এথেন্সের গৌরব দেখে স্পার্টানরা ঈর্ষান্বিত হয় এবং এথেন্সের গৌরব খর্ব করার জন্যে যুদ্ধ শুরু করে দেয়। এই যুদ্ধ প্রায় সাতাশ বছর চলে এবং শেষে স্পার্টানরাই বিজয়ী হয়। এথেন্সের প্রাধান্য সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়।

সপ্তম পাঠ : এথেন্সের সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্ব

রাজনৈতিক প্রাধান্য হারালেও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এথেন্স চিরকাল শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছে। পেরিক্লিস এথেন্সকে গ্রীসের সাংস্কৃতিক জীবনের কেন্দ্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন এবং তাতে সফলও হয়েছিলেন। এই সময়ে এথেন্সে খুব বড় বড় ঐতিহাসিক, নাট্যকার, ভাস্কর ও দার্শনিকের জন্ম হয়। তাঁরা এথেন্সের গৌরবকে চিরকালের জন্যে উজ্জ্বল করে রেখেছে। এই জন্যে পেরিক্লিসের যুগকে এথেন্সের স্বর্ণযুগ বলা হয়।

পারসিক সম্রাট জার্কসিস এথেন্স পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। পেরিক্লিস সেই নগরকে আবার নতুন করে গড়ে তোলেন। তাঁর নির্দেশে বিখ্যাত ভাস্কর ফিডিয়াস অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর মন্দির ও মূর্তি তৈরী

করলেন। এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল 'পার্থেনন'—এথেন্সের নগরদেবী এথেনার মন্দির দেবী এথেনার দুটি মূর্তিও তিনি তৈরী করেন। এই আমলে সাহিত্যেও এথেন্স খুব উন্নত হয়ে ওঠে। কয়েকজন বিখ্যাত নাট্যকার এই সময় তাঁদের নাটক রচনা করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন এস্কাইলাস, সফোক্লিস, ইউরিপিডিস ও এ্যারিষ্টোফেনিস্, এঁরা সকলেই এথেন্সের নাগরিক ছিলেন। পৌরাণিক কাহিনী ও নিজেদের সময়ের ঘটনা নিয়ে এঁরা নাটক লিখেছেন। ঐসব নাটকের গৌরব আজও ম্লান হয়নি। সফোক্লিসের লেখা ইডিপাস রেক্স, আন্তিগোনে ও ইলেকট্রা নাটক আজও পৃথিবীর লোক মুগ্ধ হয়ে দেখে।

পেরিক্লিস

এই যুগে এথেন্সে তিনজন বড় বড় দার্শনিকের দেখা পাওয়া যায়। এঁরা হলেন সক্রেটিস্, প্লেটো এবং অ্যারিষ্টটল। এঁদের জ্ঞানের সীমা ছিল না। পৃথিবীর লোক আজও এদের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলে শ্রদ্ধা করে। সক্রেটিস ছিলেন এঁদের মধ্যে সব চাইতে প্রবীন। প্লেটো ছিলেন সক্রেটিসের শিষ্য আর অ্যারিষ্টটল ছিলেন প্লেটোর শিষ্য। সক্রেটিস এথেন্সের পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়াতেন এবং যখনই যার সঙ্গে দেখা হত তার
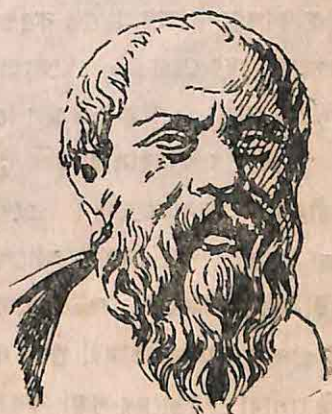
সক্রেটিস

সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন। তিনি বলতেন জ্ঞান অর্জন কর, তা হলেই ভাল মানুষ হতে পারবে এবং জীবনে আনন্দ পাবে, আর যে অজ্ঞ সে চিরকালই অন্যায় করবে এবং দুঃখ পাবে। সক্রেটিস কোন বই লেখেননি কিন্তু তাঁর শিক্ষা ও উপদেশ অনুসরণ করে পরবর্তীকালে প্লেটো ও অ্যারিষ্টটল অনেক মূল্যবান গ্রন্থ লিখে গেছেন। ঐ গ্রন্থগুলো আজও আমরা পড়ে থাকি। গ্রীক ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রবীনতম ছিলেন হেরোডোটাস। তিনি এশিয়া-মাইনরের লোক, নির্বাসিত হয়ে এথেন্সে বাস করেন। প্রচলিত গল্প শিলালিপি ও অন্যান্য লোকের লেখা বই জোগাড় করে তিনি ইতিহাস লেখেন। যতটা সম্ভব নির্ভুল তথ্য দিয়ে তিনি ইতিহাস লিখেছেন। তাঁর আগে আর কেউ এভাবে ইতিহাস লেখেননি, সেইজন্যে তাঁকে 'ইতিহাসের জনক' বলা হয়। এ যুগের আর একজন ঐতিহাসিক থুসিডাইডিস। তিনি এথেন্সের লোক হলেও স্পার্টার সঙ্গে এথেন্সের যুদ্ধের প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করেছেন, কোন পক্ষপাতিত্ব করেননি।

পেরিক্লিসের নেতৃত্বে এথেন্সে অনেক সুন্দর সুন্দর বাড়ী-ঘর, মন্দির ও মূর্তি তৈরী হয়েছিল, সে কথা আগেই তোমরা পড়েছ। ভাস্কর্যে গ্রীকরা সুন্দরের পূজা করেছে। সুসমঞ্জস মানব দেহের সৌন্দর্যই গ্রীক ভাস্করদের অনুপ্রাণিত করত। তাঁরা যে সব মূর্তি তৈরী করেছেন সেগুলো দেব-দেবী ও খেলোয়াড়দের মূর্তি এবং ঐসব মূর্তিগুলো সুগঠিত স্বাস্থ্য ও শক্তির উজ্জ্বল চিত্ররূপে বিরাজ করছে।

এথেন্সের অধিবাসীরা মূর্তি পূজায় বিশ্বাস করত। এথেন্সের নগর-দেবীর নাম ছিল এথেনা। এথেন্সবাসীরা খুব জাঁকজমক করে তাঁর পূজা করত। সূর্য দেবতা অ্যাপোলোও ছিলেন খুব জনপ্রিয় দেবতা। ডাইনিসাস, পসিডন, জিউস প্রভৃতি দেবতার পূজাও প্রচলিত ছিল। এই প্রসঙ্গে আবার তোমরা শুনে রাখ যে এথেন্সবাসী তথা সমস্ত গ্রীসের অধিবাসীরা দেবতাদের পূজা করত ভাল ফসল ও কাজে সফলতা লাভ করার জন্য, পুণ্য লাভ করার জন্য কোন দেবতার পূজা তারা করত না।

অষ্টম পাঠ ঃ ম্যাসিডন

আলেকজাণ্ডার ও তাঁর ভারত অভিযান ঃ পেরিক্লিসের আমলে এথেন্সের নেতৃত্বে গ্রীক রাজ্যগুলো এক রাজ্যে পরিণত হয়েছিল কিন্তু স্পার্টানদের সঙ্গে যুদ্ধে এথেন্স হেরে যাওয়ায় গ্রীক রাজ্যগুলো আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন গ্রীসকে আবার ঐক্যবদ্ধ করেন ম্যাসিডনের রাজা ফিলিপ। তিনি একটি শক্তিশালী সৈন্যদল গঠন করেন। এই সময় গ্রীক রাজ্যগুলো নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে খুব দুর্বল হয়ে যায়, এই সুযোগে ফিলিপ সমস্ত গ্রীস জয় করলেন। এই ফিলিপের ছেলেই বিশ্ব বিখ্যাত আলেকজাণ্ডার।

আলেকজাণ্ডারকে সব দিক থেকে গড়ে তোলার জন্য পিতা ফিলিপ সব রকম ব্যবস্থা করলেন। সেকালের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত অ্যারিষ্টটলের হাতে ছেলের শিক্ষার ভার দিলেন। গুরুর কাছে আলেকজাণ্ডার অনেক কিছু শিখলেন। হোমারের মহাকাব্য দুখানি পড়তে আলেকজাণ্ডারের খুব ভাল লাগত এবং ঐ মহাকাব্যের বীরদের মত মস্ত বড় বীর হবার তিনি স্বপ্ন দেখতেন।

আলেকজাণ্ডার

আলেকজাণ্ডারের যখন কুড়ি বছর বয়স তখন রাজা ফিলিপের মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর আলেকজাণ্ডার ম্যাসিডনের রাজা হলেন। তিনি সঙ্কল্প করলেন পারস্য জয় করে পারসিক সম্রাটদের গ্রীস আক্রমণের প্রতিশোধ নেবেন এবং এসিয়া ও ইউরোপে গ্রীক সভ্যতা ছড়িয়ে দেবেন। রাজা হয়ে দু বছর পরে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পড়লেন। এসিয়া মাইনরের ভিতর দিয়ে যাত্রা করে সিরিয়া, টায়ার, সিডন, মিশর, ব্যাবিলন প্রভৃতি জয় করে পারসিক দেশে

উপস্থিত হলেন। পারস্য সম্রাট তৃতীয় দারাউস তাঁকে বাধা দিতে এসে পরাজিত হলেন।

পারসিক সাম্রাজ্য জয় করে আলেকজাণ্ডার ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে তখন অনেকগুলো ছোট ছোট রাজ্য ছিল। এদের মধ্যে তক্ষশিলার রাজা অম্ভি বিনা যুদ্ধেই
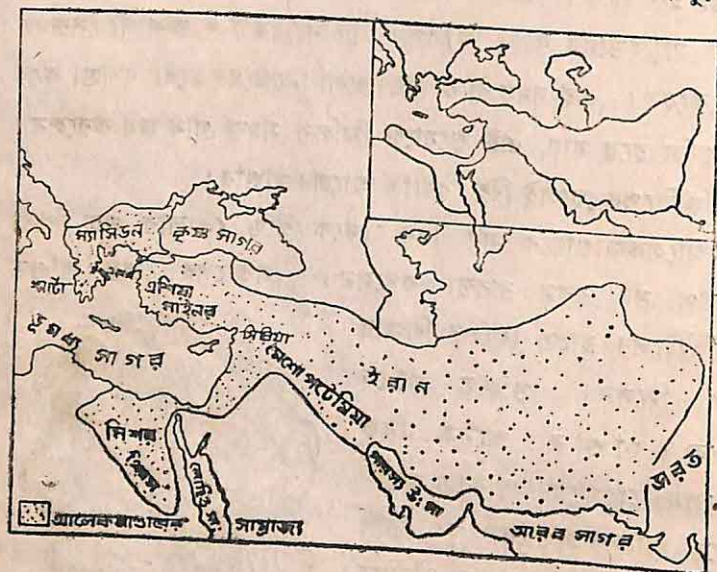
আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয়

আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করলেন এবং যুদ্ধের রসদ ও সৈন্য দিয়ে সাহায্য করলেন। এইভাবে আলেকজাণ্ডার ঝিলাম নদীর তীরে এসে উপস্থিত হলেন। ঝিলামের অপর পারে পুরু রাজ্য। আলেকজাণ্ডারের দূত গিয়ে রাজা পুরুকে বশ্যতা স্বীকার করতে বললে পুরুরাজ তা ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখান করলেন। ফলে পুরুর সঙ্গে আলেকজাণ্ডারের যুদ্ধ হল। গ্রীক ঐতিহাসিকরা এই যুদ্ধকে হাইদিস্‌পিসের যুদ্ধ বলে বর্ণনা করেছেন। যুদ্ধে পুরু পরাজিত ও বন্দী হলেন। বন্দী হয়েও রাজা পুরু নিজের মর্যাদা ভুললেন না। তিনি বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে রাজার মর্যাদা নিয়ে কথা বললেন। আলেকজাণ্ডার তাঁর ব্যবহারে

ও সাহসিকতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে মুক্তি দিলেন এবং তাঁর রাজ্যও তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন।

এর পরে আলেকজাণ্ডার বিপাশা নদীর তীরে এসে উপস্থিত হলেন। নদীর অপর তীরেই মগধের সাম্রাজ্য। আলেকজাণ্ডার সংবাদ পেলেন মগধ সম্রাট ধননন্দ বিরাট সৈন্য নিয়ে তাঁকে বাধা দেবার জন্য অপেক্ষা করছেন। আলেকজাণ্ডারের সৈন্যবাহিনী সেই সংবাদ পেয়ে ভয় পেয়ে গেল, তারা আর এগিয়ে যেতে চাইল না। আলেক-জাণ্ডার অনেক চেষ্টা করেও তাদের মত পরিবর্তন করতে পারলেন না। ফলে বিপাশা নদীর তীর থেকেই তাঁকে ফিরে যেতে হল।

আলেকজাণ্ডার যে পথে এসেছিলেন সে পথে ফিরলেন না। ঝিলাম নদীর তীরে এসে তিনি দক্ষিণ দিক ধরে চলতে লাগলেন। পথে মালব, ক্ষুদ্রক প্রভৃতি রাজ্য জয় করে সিন্ধু নদীর মোহনায় উপস্থিত হলেন। সেখান থেকে তিনি বেলুচিস্তানের ভিতর দিয়ে ব্যাবিলনে ফিরে এলেন। অল্প কিছু দিন পরে ব্যাবিলন নগরেই তাঁর মৃত্যু হয়।

নবম পাঠ ঃ গ্রীক সাম্রাজ্যের পতন

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব নিয়ে দীর্ঘদিন গ্রীক সেনাপতিদের মধ্যে যুদ্ধ চলে। পরে সেখানে তিনটি স্বাধীন গ্রীক রাজ্য তৈরী হয়। এই রাজ্য তিনটির নাম ম্যাসিডন, মিশর ও সিরিয়া। সিরিয়ার রাজা সেলিউকাস সমস্ত পশ্চিম এসিয়ায় নিজের প্রাধান্য স্থাপন করেন।

গ্রীস অনেক দিন ম্যাসিডনের অধীন ছিল। তারপর ম্যাসিডনের সঙ্গে রোমানদের যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধের সময় গ্রীক রাজ্যগুলো তাদের স্বাধীনতা ফিরে পাচ্ছিল। একজন রোমান সেনাপতি গ্রীক রাজ্য-গুলোকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করে দেয়। কিন্তু গ্রীক রাজ্যগুলোর মধ্যে ঝগড়া বিবাদের বিরাম ছিল না। একবার কয়েকটা গ্রীক রাজ্য একসঙ্গে মিলে রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। রোমানরা এই বিদ্রোহ দমন করে সমগ্র গ্রীস রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

সপ্তম পর্ব ॥ রোমের কাহিনী

প্রথম পাঠ : রোম নগরীর প্রতিষ্ঠা

গ্রীকদের মত রোমানরাও ছিল আর্যজাতির শাখা। এরা আল্পস পর্বত পার হয়ে ইটালীতে আসে এবং টাইবার নদীর তীরে বসবাস শুরু

করে। কিছু কাল পরে তারা টাইবারের তীরে রোম নগরী তৈরী করে। এরা গ্রীক সভ্যতার অনুরাগী ছিল এবং এরাই গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতি ইউরোপের বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দেয়।

রোম নগরের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একটা মজার গল্প আছে। এক রাজকন্যার দুই যমজ ছেলে ছিল। তাদের নাম রোমুলাস ও রেমাস এদের মেরে ফেলবার জন্য এক দুষ্ট রাজা তাদের টাইবারের জলে ভাসিয়ে দেয়। কিন্তু একটা নেকড়ে বাঘিনী তাদের দেখতে পেয়ে জল থেকে তুলে আনে এবং নিজের দুধ খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখে। আরো কিছুদিন পরে এক রাখাল বালক শিশু দুটিকে লুকিয়ে নিয়ে এসে মানুষ করতে থাকে। অনেকদিন পরে যখন তারা নিজেদের পরিচয় জানতে পারল তখন তারা দুষ্ট রাজাকে মেরে

ফেলল। পরে বড় ভাই রোমুলাস রাজা হল। তারা এরপর একটা শহর প্রতিষ্ঠা করল এবং বড় ভাই রোমুলাসের নামে শহরের নাম হল রোম। এই রোমুলাসই রোমের প্রথম রাজা।

প্রায় আড়াইশ বছর ধরে রাজারা রোমে রাজত্ব করত। রোমে সম্ভ্রান্ত পরিবারের প্রবীনদের একটা সভা ছিল, তার নাম সেনেট। রাজারা সেনেটের সঙ্গে আলোচনা করে শাসন কাজ চালাতেন। যাই হোক, শেষের দিকে রোমের রাজারা অত্যাচারী হয়ে ওঠে। তখন তাদের শেষ রাজাকে তাড়িয়ে রোমে একটা প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় পাঠ ঃ রোম ও কার্থেজের মধ্যে লড়াই

রোমের অধিবাসীরা শক্তিশালী হয়ে আস্তে আস্তে সমস্ত ইটালী জয় করে ফেলে। তারা আরও রাজ্য জয় করার নেশায় মেতে ওঠে। এই সময় ভূমধ্যসাগরের অপর তীরে কার্থেজ নামে একটা নগর ছিল। ব্যবসা বাণিজ্য করে কার্থেজবাসীরাও খুব বড় লোক হয়ে ওঠে। ভূমধ্যসাগরের বিভিন্ন দ্বীপে বিশেষ করে রোমের খুব কাছে সিসিলি দ্বীপে কার্থেজবাসীরা অনেক বাণিজ্য কেন্দ্র তৈরী করে প্রচুর ধন-সম্পদ উপার্জন করত। এখন এই বাণিজ্যের কর্তৃত্ব নিয়ে রোম ও রোমের অধিবাসী ও কার্থেজের বণিকদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ শুরু হয়। সিসিলিতে কার্থেজের বাণিজ্য কেন্দ্রগুলো রোমের বণিকরা দখল করতে চায়, ফলে রোম ও কার্থেজের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। ইতিহাসে এই যুদ্ধকে পিউনিক যুদ্ধ বলা হয়।

রোমের সঙ্গে কার্থেজের এই যুদ্ধ প্রায় একশ কুড়ি বছর ধরে চলে। প্রথম দিকে কার্থেজের সেনাপতি হ্যামিলকার বারকা রোমের কাছে হেরে যায় এবং সিসিলি ও সার্ডিনিয়া দ্বীপ দু'টা রোমানরা দখল করে নেয়। এরপর হ্যামিলকারের ছেলে বিশ্ববিখ্যাত হ্যানিবল কার্থেজের সেনাপতি হলেন। তিনি স্পেন থেকে যাত্রা করে বিরাট আল্পস

পর্বত পার হয়ে ইটালীতে প্রবেশ করলেন। তাকে রোমানরা বাধা দিতে পারল না তিনি রোম অবরোধ করলেন। কিন্তু দেশপ্রেমে অনুপ্রানিত রোমান নগরীর অধিবাসীদের কাছ থেকে রোম কেড়ে নিতে পারলেন না। সমস্ত ইটালী জয় করে রোমের দরজায় তাঁর জয় যাত্রা থেমে গেল। ইতিমধ্যে রোমানরা হ্যানিবলকে ইটালীতে হারাতে না পেরে হ্যানিবলের স্বদেশ কার্থেজ আক্রমণ করল। কার্থেজবাসীরা হ্যানিবলকে ডেকে পাঠাল স্বদেশ রক্ষার জন্যে। হ্যানিবল কার্থেজ রক্ষার যুদ্ধে রোমান সেনাপতি সিপিয়োর কাছে হেরে গেলেন রোম কার্থেজ দখল করল। হ্যানিবল আত্মসমর্পণ না করে আত্মহত্যা করলেন। এরপর আরো পঞ্চাশ বছর পর রোমানরা কার্থেজ সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। হ্যানিবলের মত কোন সেনাপতি আবার যদি কার্থেজে দেখা দেয় এই ভয়েই রোমানরা কার্থেজ ধ্বংস করে।

তৃতীয় পাঠ ঃ রোমের আদি সমাজ, প্যাট্রিসিয়ান-প্লেবিয়ান/ রোমান নাগরিক

একেবারে প্রথম দিকে রোমক সমাজে দুই শ্রেণীর লোক ছিল। প্রথম শ্রেণীতে ছিল সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকেরা তাদের বলা হত 'প্যাট্রিসিয়ান'। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেদের বলা হত সাধারণ শ্রেণী বা 'প্লেবিয়ান'। প্যাট্রিসিয়ানরাই ছিল অধিকাংশ জমি-জমার মালিক এবং তারাই সেনেট বা প্রবীণদের সভা পরিচালনা করত। গরীব কৃষক, কারিগরী শিল্পী, বনিক এবং সৈনিকরা ছিল প্লেবিয়ান শ্রেণীর লোক।

প্যাট্রিসিয়ানরাই রাজ্যের সব ক্ষমতা দখল করেছিল। জমি-জমা, সুযোগ-সুবিধে সব তাদেরই ছিল। প্লেবিয়ানদের কোন ক্ষমতাই ছিল না। রাজশক্তি হাতে থাকার জন্য প্যাট্রিসিয়ানরা সহজেই প্লেবিয়ানদের দাবিয়ে রাখতে পারত। প্লেবিয়ানরা কিন্তু এই অবস্থা বেশীদিন মেনে

নেয়নি। তারা জানত যে তাদের সাহায্য না পেলে রাজ্যও বাড়ান যাবে না, দেশের ধন-সম্পদও উৎপন্ন হবে না। তখন তাদের সঙ্গে প্যাট্রিসিয়ানদের ঝগড়া শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত প্লেবিয়ানদের অনেক দাবীই প্যাট্রিসিয়ানরা মেনে নেয়। প্লেবিয়ানদের স্বার্থ দেখার জন্যে ট্রিবিউন নামে শক্তিশালী রাজ-কর্মচারী নিযুক্ত হলেন এবং রোমের আইনগুলোকে সঙ্কলন করে কাঠের ফলকে লিখে ফেলা হল। এর ফলে প্যাট্রিসিয়ান বিচারকরা যেমন খুশী বিচার করতে পারত না।

নাগরিক অধিকারের বিষয়ে রোমের নাগরিকেরা বেশ উদার নীতি নিয়েছিল। একমাত্র দাস ছাড়া সকলেই নাগরিক অধিকার পেত। এর পর যখন ইটালীতে রোমের প্রাধান্য স্থাপিত হল, তখন ইটালীর অন্য রাজ্যের নাগরিকরাও রোমের নাগরিক অধিকার দাবী করে। এই নিয়ে রোমানদের সঙ্গে ইটালীর অন্যান্য অধিবাসীদের মারামারি আরম্ভ হয়, শেষে ইটালীর অন্যান্য জাতিও রোমের নাগরিক অধিকার লাভ করে। রোমানরা নাগরিক অধিকারকে খুব মূল্যমান মনে করত, কারণ নাগরিক অধিকার ছাড়া রাজদরবারে কোন অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিচার প্রার্থনা করা যেত না।

চতুর্থ পাঠ ঃ দাস-প্রথা / দাস বিদ্রোহ

রোমের সম্ভ্রান্ত ধনী অধিবাসীরা আরামে ও বিলাসে দিন কাটাত। কিন্তু সাধারণ গরীবশ্রেণীর লোকের দুঃখ কষ্টের সীমা ছিল না। এই দুঃখী শ্রেণীর লোকের মধ্যে সব চাইতে দুঃখের জীবন ছিল দাস শ্রেণীর। পরাজিত দেশের লোকেদের রোমানরা দাস করে নিয়ে আসত এবং তাদের দিয়ে জাহাজের দাঁড় টানা, খনির কাজ, চাষবাসের কাজ, রাস্তা তৈরীর কাজ প্রভৃতি শক্ত শক্ত কাজগুলো করাত। দু' একজন ভাগ্যবান দাস দয়ালু মালিকের কাছে ভাল ব্যবহার পেলেও বেশীর ভাগ দাসকে অমানুষিক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হত। এই

দাসদের সব সময় পায়ে লোহার শিকল পরে থাকতে হত এবং কাজ করতে না পারলে চাবুক খেতে হত।

এই সব দাসদের একদলকে বলা হত মল্লযোদ্ধা বা গ্লাডিয়েটর। এদের বাঘ সিংহের সঙ্গে অথবা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে খেলা দেখাতে হত। রোমের নিষ্ঠুর নাগরিকরা ঐ খেলা দেখতে খুব ভালবাসত। রোমের কলোসিয়ামে এই খেলার অনুষ্ঠান হত। এই খেলায় খেলোয়াড়দের একজন না মরা পর্যন্ত খেলা চলত। কোন কোন সময় দুজন খেলোয়াড়ই মারা পড়ত, না হয় বাঘ-সিংহের পেটে যেত।

গ্লাডিয়েটর

দাসদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার জন্যে কয়েকবারই দাসরা বিদ্রোহ করেছিল। রোমান সৈন্যরা প্রত্যেকবারই নিষ্ঠুরভাবে এই সব বিদ্রোহ দমন করে। একবার স্পার্টাকাস নামে একজন গ্লাডিয়েটর কয়েক হাজার দাসকে সঙ্ঘবদ্ধ করে বিদ্রোহ করল। দু বছর ধরে এরা রোমান সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হেরে গেল। হাজার হাজার পরাজিত দাসকে নিষ্ঠুরভাবে ক্রস কাঠে পেরেক মেরে হত্যা করা হল। রাজপথের দুধারে ক্রসে বিদ্ধ দাসদের মৃতদেহগুলো মাসের পর মাস সাজিয়ে রেখে দেওয়া হল। স্পার্টাকাস কিন্তু মরেনি, তার শক্তি ও সাহসের কথা স্মরণ করে আজও শোষিত ও অত্যাচারিত মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

পঞ্চম পাঠ : জুলিয়াস সীজার/প্রজাতন্ত্রের পতন ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা

প্রথম যুগে রোমের অধিবাসীরা সাদাসিদে জীবন যাপন করত। সাধারণতঃ কৃষিকাজ ও পশুপালন করে তারা জীবিকা নির্বাহ করত। দেশকে তারা প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। পরবর্তীকালে গ্রীস ও কার্থেজ

জয় করার পর রোমে একদল ধনিক শ্রেণী সৃষ্টি হল। তাদের অনেক জমিজমা ছিল, ক্রীতদাসরা এগুলো চাষ করত আর ধনী মালিকরা আরাম করে বিলাসী জীবন যাপন করত। সাধারণ কৃষকদের অবস্থা এই সময়ে খুব খারাপ হয়ে যায়। ক্রীতদাসদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তারা সস্তায় ফসল ফলাতে পারত না। অন্য কাজও জুটত না, সে সমস্ত কাজ ক্রীতদাসরাই করত। ফলে রাজ্যের মধ্যে প্রবল অশান্তি দেখা দেয়। অন্যদিকে দাস বিদ্রোহ দমন করার পর সেনাপতিরাও শক্তিশালী হয়ে পড়ে। তারা দুঃখী সৈন্য ও সাধারণ গরীব কৃষকদের দুঃখে সমবেদনা দেখিয়ে তাদের সমর্থন লাভ করে এবং রাজ্যের শাসন ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা করতে থাকে। এই সব সেনাপতিদের দুজনের নাম জুলিয়াস সীজার ও পম্পী। ক্ষমতা দখলের ব্যাপারে এই দুইজনের মধ্যে ঝগড়া বেধে যায়। এই সময় পম্পী নিহত হলে সীজারের খুব সুবিধা হয়। তিনি অল্পকালের মধ্যেই সমস্ত শাসন ক্ষমতা দখল করে রোম প্রজাতন্ত্রের সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ হলেন। তিনি অনেকগুলো শাসন সংস্কার করলেন। গরীব কৃষকদের ও সৈন্যদের মধ্যে বিনামূল্যে চাষের জমি বিতরণ করলেন। তাঁর ক্ষমতা দিন দিন বাড়ছে দেখে সেনেটের সভ্যরা ভাবল সীজার সম্রাট হওয়ার চেষ্টা করছে। এই ভেবে চক্রান্ত করে তারা সীজারকে হত্যা করল।

জুলিয়াস সীজার

সীজার নিহত হলে সীজারের আত্মীয় অক্টেভিয়ান এবং বন্ধু এণ্টনি ও লিপিডাসের সঙ্গে সীজারের হত্যাকারীদের লড়াই শুরু হল। চক্রান্তকারীদের দুই প্রধান ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াস যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হল। রোমক প্রজাতন্ত্রও শেষ হল।

এই ঘটনার পর অক্টেভিয়ান রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট হয়ে বসলেন। সেনেট তাঁকে 'অগাষ্টাস' বা 'মহামহিমান্বিত' উপাধি দিল। শুরু হল রোম সাম্রাজ্যে সম্রাটদের যুগ।

অগাষ্টাস সুশাসক ছিলেন। তিনি সুশাসন ও বিভিন্ন শাসন সংস্কার করে সাম্রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনলেন। কিন্তু সকলেই তাঁর মত ছিলেন না। এদের মধ্যে মার্কাস অরেলিয়াস ছাড়া বেশীর ভাগ সম্রাটই নিষ্ঠুর ও খামখেয়ালী ছিলেন।

ষষ্ঠ পাঠ : রোমের পতন

রোম সাম্রাজ্যের গৌরব কিন্তু চিরকাল অটুট রইল না। পরবর্তী দুশো বছরের মধ্যেই রোম সাম্রাজ্যের পতন হল। সম্রাটরা হয়ে উঠলেন অত্যাচারী। শাসন বিষয়ে মন না দিয়ে খেয়াল খুসী চরিতার্থ করেই তাঁরা দিন কাটাতেন। শাসন কাজ চালাত সৈন্যরা। সৈন্যরা খুসী মত সম্রাটদের ওঠাতেন বসাতেন। রাজ্যের সাধারণ লোকেরাও অত্যধিক করের চাপে ও কুশাসনে বিরক্ত হয়ে পড়েছিল। এই রকম যখন অবস্থা তখন রোমসাম্রাজ্যের উত্তর অঞ্চল থেকে ফ্রাঙ্ক, ভাণ্ডাল, গথ প্রভৃতি জার্মান উপজাতিরা বার বার আক্রমণ করে পশ্চিম ইউরোপের রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস করে দিল।

সপ্তম পাঠ : খ্রীষ্টধর্মের অভ্যুদয়

মোজেস ইহুদীদের দাসত্ব হতে মুক্ত করে প্যালেষ্টাইনে বসবাস করতে বলেন। ঐখানে তারা স্বাধীন রাজ্য গঠন করে সুখে শান্তিতে বাস করছিল। কিছুকাল পরে তাদের মধ্যে গৃহবিবাদ আরম্ভ হয়, সেই সুযোগে অন্য দেশের লোকেরা এসে তাদের স্বাধীনতা কেড়ে নেয়। সব শেষে আসে রোমানরা। তাঁদের অত্যাচারে ইহুদীদের দুর্গতি সুরু হয়। এই দুঃখের দিনে ইহুদীদের মধ্যে এক মহাপুরুষের জন্ম হয়, তাঁর নাম যীশু। তিনিই খ্রীষ্টান ধর্ম প্রবর্তন করেন।

প্যালেষ্টাইনে নাজারেথ শহরের যোশেফ নামে এক গরীব ছুতোরের ঘরে যীশুর জন্ম হয়। তাঁর মায়ের নাম মেরী।

যীশুর শৈশব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাঁর বয়স যখন ত্রিশ বছর তখন তিনি সহজ কথায় ছোট ছোট নীতিগল্প দিয়ে সাধারণ লোকেদের উপদেশ দিতেন। অশিক্ষিত লোকেরাও সেই উপদেশগুলো সহজে বুঝতে পারত। তাঁর সরল জীবন যাপন, মহান ব্যক্তিত্ব এবং সকলের জন্য অসীম ভালবাসা ও করুণা দেখে অনেক লোক তাঁর কাছে ছুটে আসত।

তিনি বলতেন "ঈশ্বরকে ভালবাস, সকল মানুষই ভগবানের সন্তান তাই প্রত্যেক মানুষই প্রত্যেকের ভাই; নিজের ভাই মনে করে প্রত্যেককে ভালবাসবে, ভালবাসা দিয়ে শত্রুর হৃদয় জয় করবে, অপকারের বদলে উপকার করবে, এবং সৎ জীবন যাপন করে পৃথিবীতে ভগবানের রাজ্য গড়ে তুলবে।" যীশুর উপদেশে মুগ্ধ হয়ে অনেকে তাঁর শিষ্য হল।

যীশু নির্ভীক ভাবে ইহুদী সমাজের প্রচলিত অন্যায় প্রথার নিন্দা করতেন। এর ফলে ইহুদীদের শক্তিশালী পুরোহিত শ্রেণী ও প্রভাবশালী ধনিক শ্রেণী যীশুর ওপর ক্ষেপে ওঠে। এরা রোমান শাসক পন্টিয়াস পাইলেটের কাছে যীশুর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনে। যীশু যখন জেরুজালেম নগরে যান তখন অনেকে তাঁকে "ইহুদীদের রাজা" বলে সম্বোধন করেন। এই কথাটাকেই যীশুর শত্রুরা রোমান সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলে অভিযোগ করল। তারপর বিচারের প্রহসন করে যীশুকে ক্রসে বিদ্ধ করে হত্যা করা হল। ক্রস কাঠে বিদ্ধ করে যীশুকে হত্যা করা হয়েছিল বলে খ্রীষ্টানরা ক্রস কাঠকে পবিত্র জ্ঞানে শ্রদ্ধা করে। খ্রীষ্টান মুসলমান প্রভৃতি ধর্মের লোকেরা যীশুকে ভগবানের পুত্র বা দূত বলে শ্রদ্ধা করে। তারে মনে করে যীশুর মৃত্যু হয়নি। ক্রস বিদ্ধ হবার তিনদিন পরে যীশু মৃত্যুর জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে শিষ্যদের দেখা দেন এবং সশরীরে স্বর্গে যান।

যীশুর স্বর্গযাত্রার পর তাঁর দুজন প্রধান শিষ্য পিটার ও পল রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে যীশুর উপদেশগুলো প্রচার করে বেড়াতেন। রোম
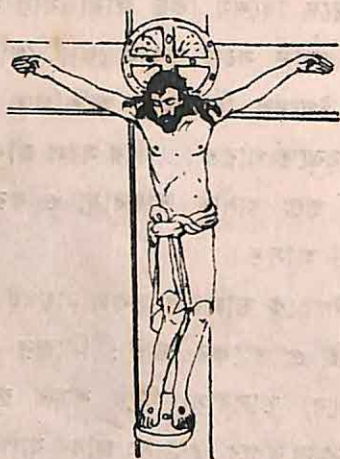
যীশু

সম্রাটরা এই কারণে খ্রীষ্টানদের উপর খুব অত্যাচার করতেন। খ্রীষ্টানদের এই সময় পুড়িয়ে মারা হত, হিংস্র জন্তুর মুখে ফেলে দেওয়া হত। কিন্তু এত অত্যাচার করেও খ্রীষ্ট ধর্মের গতিরোধ করা গেল না। দলে দলে রোমান সাম্রাজ্যের লোকেরা খ্রীষ্টান হয়ে গেল। শেষে রোমান সম্রাট কনষ্টানটাইন যখন খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করলেন তখন খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের আর বাধা রইল না। আস্তে আস্তে সমস্ত রোমক সাম্রাজ্যই খ্রীষ্টান হয়ে গেল।

অষ্টম পর্ব ॥ চীন

প্রথম পাঠ : সাঙ বংশের রাজত্ব কনফুসিয়াস

আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে চীন সভ্যতার জন্ম হয়। সেই সময় সাঙ বংশের রাজারা হোয়াঙ-হো নদীর তীরে রাজ্য স্থাপন করেছিল। ঐ নদীর তীরে মাটি খুড়ে সাং রাজাদের রাজধানীর সন্ধান পাওয়া গেছে। মাটির তলা থেকে যা পাওয়া গেছে তা থেকে বোঝা যায় সাঙ আমলে চীনারা বেশ উন্নত মানের সভ্যতা তৈরী করেছিল। তারা ধাতুর ব্যবহার শিখেছিল এবং লেখার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল। ঐ সময়কার কবর খুঁড়ে সেকালের বহু জিনিস-পত্র পাওয়া গেছে। এগুলো দেখে মনে হয় সাঙ যুগের জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত ছিল।

সাঙ রাজ্যের অধিবাসীরা চাষ-বাস করতে জানত। চাষের জমিতে জলসেচ করা এবং হোয়াঙ হো নদীর বন্যা রোধ করার জন্য দেশের মধ্যে অনেক খাল কেটেছিল। তারা জমিতে প্রচুর জোয়ার ও গম উৎপন্ন করত, ঘরে ঘরে গরু, ভেড়া, শুকর, মুরগী পুষত, তাদের খাওয়া পরার অভাব ছিল না। এছাড়া তারা রেশমকীট থেকে রেশম তৈরী করতে শিখেছিল এবং চীনা মাটি দিয়ে সুন্দর সুন্দর চক্‌চকে পাত্র তৈরী করত। চীনা মাটির পাত্র তৈরী করার কৌশল এই যুগের চীনারাই প্রথম আবিষ্কার করেছিল।

সাঙ রাজ্যের প্রতিবেশী অঞ্চলগুলো তখনও পর্যন্ত বেশ অসভ্য ছিল। তারা প্রায়ই সাঙ রাজ্যে ঢুকে পড়ে লুটতরাজ করত, তাই ঐ সমস্ত অসভ্য লোকদের হাত থেকে রাজ্যের অধিবাসীদের রক্ষা করার জন্য সাঙ রাজাদের সব সময় সৈন্য নিয়ে তৈরী থাকতে হত। এর ফলে সাঙ রাজাদের ক্ষমতা খুব বেড়ে যায়। পরবর্তী কালে সাঙ রাজারা

দুর্বল হয়ে যায় এবং তাদের তাড়িয়ে দিয়ে চৌ বংশের রাজারা সিংহাসন দখল করে। সাঙ রাজাদের তাড়িয়ে দিলেও চৌ রাজারা সাঙ যুগের সভ্যতা নষ্ট হতে দেয়নি।

চৌ রাজাদের আমলে চীনে সামন্ত প্রথার প্রচলন হয়। সামন্তরা রাজার ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে নিজ নিজ এলাকায় খুদে রাজা হয়ে বসল।

সাঙ্ সভ্যতা

দেশের রাজাকে তারা মানে না, আর ক্ষমতা বাড়ানোর জন্যে নিজেদের মধ্যে দিন রাত মারামারি করে। সামন্ত প্রভুরা প্রজাদের ওপরেও খুব অত্যাচার করত। দেশের রাজা দুর্বল, তিনি প্রজাদের দুঃখ দূর করতে পারতেন না। এই সময় আবার উত্তর দিক হতে হুণ, ইউচি প্রভৃতি অনভ্যজাতের লোকেরা চীন আক্রমণ করতে লাগল। ফলে দেশের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ল, সাধারণ লোকের দুঃখ-কষ্টের আর সীমা রইল না।

দেশের এই দুর্দিনে চীনে এক মহাপুরুষ জন্ম নেন। তাঁর নাম কন্‌ফুসিয়াস্। মানুষের দুঃখ দেখে তিনি বিচলিত হলেন এবং কি করে তাদের দুঃখ দূর করা যায় তার পথ খুঁজতে লাগলেন। পথ খুঁজতে খুঁজতে তিনি বুঝতে পারলেন যে দেশের নৈতিক অধঃপতনই দুঃখ কষ্টের মূল কারণ। মানুষ যদি চরিত্রবান হয়, তার মন যদি সুন্দর ও মহান হয় তখনই মানুষের জীবনে শান্তি আসবে।

এই শিক্ষা প্রচার করার জন্যে কনফুসিয়াস শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করলেন। ইতিহাস, পৌরাণিক কাব্য ও ভদ্র আচার-ব্যবহার-এর ওপর জোর দিয়ে তিনি শিক্ষা দিতেন। ছাত্রদের কয়েকজন তাঁর সঙ্গে তাঁর বাড়ীতেই বাস করত। গুরুর কথা শুনে এবং দৃষ্টান্ত দেখে তারা চরিত্র গঠন করুক এই ছিল কনফুসিয়াসের উদ্দেশ্য।

কনফুসিয়াসের গভীর জ্ঞানের কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তখন একজন শক্তিশালী সামন্ত রাজা তাঁকে চাঙতু নামের একটা শহরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। তাঁর সুশাসন ও শিক্ষার গুণে শহর হতে বিলাসিতা ও অসাধুতা দূর হল। কিন্তু বেশী দিন তিনি ঐ কাজ করতে পারলেন না। তিনি চাকরী ছেড়ে দিয়ে আবার দেশে দেশে ঘুরতে লাগলেন।

কনফুসিয়াস

কনফুসিয়াসের শেষ জীবন সুখের হয় নাই। তাঁর পুত্র এবং কয়েকটি ভাল ছাত্র মারা যাওয়াতে তিনি মুষড়ে পড়লেন এবং অল্পদিন পরেই মারা গেলেন।

কনফুসিয়াসের পরিশ্রম ও সাধনা ব্যর্থ হয়নি। চীনের জাতীয় চরিত্রে কনফুসিয়াস যে প্রভাব রেখে গেলেন তা আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে। তিনি বলেছেন—সমাজকে উন্নত কর, যে সব প্রথা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে সেগুলোকে শ্রদ্ধা কর, পিতামাতা ও গুরুজনদের ভক্তি কর, দেশের রাজাকে পিতার মত শ্রদ্ধা কর, রাজারাও প্রজাদের ছেলের মত যত্ন করুক। এইভাবে চললে সমাজে তথা দেশে কোন

অশান্তি থাকবে না, সবাই সুখে সাচ্ছন্দে বাঁচতে পারবে। চীনের লোকেরা সেই সব উপদেশ আজও ভোলেনি।

দ্বিতীয় পাঠ : চীন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

তোমরা আগেই পড়েছ সামন্ত প্রভুরা শক্তিশালী হয়ে পড়লে চৌ রাজারা দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সুযোগে হূণ, উইচি প্রভৃতি যাযাবর জাতিগুলো চৌ রাজাদের রাজ্যে বার বার হানা দেয়। এই রকম অবস্থা বহুদিন ধরে চলে। শেষে খ্রীঃ পূর্ব তৃতীয় শতকে ঐ অঞ্চলে তিনটি রাজ্য প্রধান হয়ে ওঠে, তাদের নাম হল—চীন, চু এবং চী। এদের মধ্যে আস্তে আস্তে চীন রাজ্য শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং চীন রাজ্যের রাজা শি-হুয়াঙ-তি অন্য রাজ্য দুটোকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে সম্রাট উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর সাম্রাজ্য সমস্ত হোয়াঙ-হো ও ইয়াঙ-সি-কিয়াঙ নদীর উপত্যকায় বিস্তৃত হয়। তাঁর ছোট রাজ্য চীনের নামে তাঁর সাম্রাজ্যের নাম হল চীন সাম্রাজ্য।

শি-হুয়াঙ-তি সুশাসক ছিলেন। শাসন ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা স্থাপন করেন, সাম্রাজ্যের সবদিকে ভাল ভাল রাস্তা তৈরী করেন এবং উত্তরের অসভ্য জাতির আক্রমণ থেকে তাঁর সাম্রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য বিখ্যাত 'চীনের প্রাচীর' তৈরীর কাজ শুরু করেন। এই প্রাচীরটি ছিল আঠারশ মাইল লম্বা, বাইশ ফুট উঁচু আর কুড়ি ফুট চওড়া। এ ছাড়াও তিনি মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কার করেন, ওজন ও পরিমাপ সম্বন্ধে সঠিক মান বেঁধে দেন ও চীনের লিপি সংস্কার করেন।

শি-হুয়াঙ-তি চীন রাজ বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট। তাঁর মৃত্যুর পর হান বংশের সম্রাটরা চীন সাম্রাজ্য দখল করে নেয়।

নবম পর্ব ॥ ভারত

প্রথম পাঠ ঃ আর্যজাতির ভারত আগমন

কোন কোন ঐতিহাসিক ভারতই আর্যদের আদি বাসস্থান বলে উল্লেখ করলেও অধিকাংশের মতে আর্যরা ভারতে বহিরাগত। তাঁদের সিদ্ধান্ত আজ থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর আগে আর্যরা সম্ভবত মধ্য এশিয়া অথবা মধ্য বা পূর্ব ইউরোপের কোনো অঞ্চল থেকে ছোট ছোট কয়েকটি শাখায় ভাগ হয়ে দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে নতুন নতুন বাসস্থানের সন্ধানে ছড়িয়ে পড়ে। মূল বসতি ছেড়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ার কারণ হিসাবে তাঁরা সেই অঞ্চলে বিপর্যয়কর কোনো প্রাকৃতিক পরিবর্তনের কথা বলেন। তবে যে কারণই হোক ঘটনা হ'ল এই যে এই ছোট ছোট দলের একটি উত্তর-পশ্চিমের গিরিপথ পার হয়ে এসে পৌঁছেছিল ভারতে। সিন্ধু-নদ আর তার উপনদীর উপত্যকার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে তারা গড়েছিল তাদের মূল ভারতীয় উপনিবেশ। আর্যদের অন্য শাখাগুলির কোনটি ইরানে, কোনটি গ্রীসে আর অন্যগুলি ইউরোপের নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল।

যাযাবর আর্যরা এইভাবেই ছোট ছোট কৃষি-এলাকা তৈরি করে স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্যোগ শুরু ক'রে। ধীরে ধীরে তারা গড়ে তোলে তাদের নিজস্ব ধরণের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বনিয়াদ। আর্য-সভ্যতা ছিল মূলতঃ গ্রামীন সভ্যতা। মাটি দিয়ে গড়া তাদের গ্রামগুলি মাটিতে মিশে গেছে। ফলে তাদের জীবন যাত্রা তাদের ধ্যান-ধারণা ও মতাদর্শ অনুসরণ করার মত প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য কিছুই নেই। তাদের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি আমরা পাই পরবর্তীকালে রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে। এই গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল আর্যদের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ 'বেদ'।

দ্বিতীয় পাঠ ঃ বেদ

আর্যদের বিশ্বাস ছিল যে বেদের রচয়িতারা সরাসরি ভগবানের মুখ থেকে বেদ রচনার উপকরণ পেয়েছিলেন। আর সেজন্যই সময়ের বিরাট ব্যবধান সত্ত্বেও বেদের কোন রকম পরিবর্তন ঘটানো হয়নি। বেদকে চার ভাগে ভাগ করা হয়—ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ব-বেদ। এদের মধ্যে সময়ের দিক থেকে ঋগ্বেদ হ'ল সবচেয়ে প্রাচীন। প্রত্যেক বেদ আবার চারটি ভাগে বিভক্ত—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। এদের মধ্যে সংহিতা অংশে আছে দেবদেবীর উদ্দেশ্যে পদ্যে লেখা অনেকগুলি মন্ত্র। ব্রাহ্মণ অংশে বর্ণনা করা হয়েছে প্রার্থনা ও যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের প্রণালী। আরণ্যকের বিষয়বস্তু অরণ্যবাসী আশ্রমিকদের জীবনযাত্রার ধরণ আর উপনিষদে আলোচনা করা হয়েছে ভারতীয় দর্শন।

তৃতীয় পাঠ ঃ আর্যদের ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা

প্রথমদিকে আর্যদের ধর্ম ছিল সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর। বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবতা কল্পনা করে পূজা করা হ'ত। কৃষি নির্ভর সমাজের সমৃদ্ধির মূলে ছিল প্রকৃতির প্রসন্নতা। সেজন্যই প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে খুশি রাখার সমস্ত রকম আয়োজন করাই ছিল ধর্মের প্রধান বিষয়। দ্যৌ, পৃথিবী, ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি—এই দেবতারা নিয়মিত আর্যদের পূজা পেতেন। পূজা অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল মন্ত্রোচ্চারণ ও আহুতি প্রদান। কালক্রমে দেবতার সংখ্যা বাড়তে থাকে, অবশ্য তার পাশাপাশি একটি নতুন উপলব্ধিও গড়ে উঠতে থাকে—প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন শক্তিগুলি একই মহাশক্তির বিভিন্ন রূপ। এই মহাশক্তির নাম দেওয়া হয় পরমব্রহ্ম। প্রথমে দেবতারা ছিলেন নিরাকার, পরে ধীরে ধীরে মূর্তি পূজার চলন হয়।

উত্তর ভারতের বিরাট এলাকা দখলে আনার জন্য এই সব অঞ্চলের আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে আর্যদের দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধবিগ্রহ চালাতে

হয়েছিল। পরবর্তীকালে আর্যসমাজে এই পরাজিত আদিবাসীদের স্থান হ'ল দাস হিসাবে। এই অনার্য দাসদের বলা হত শূদ্র। স্বভাবতই সমাজে এদের স্থান হ'ল সবার নীচে। ধীরে ধীরে আর্য সমাজেও ভাগাভাগি এল। ভাগাভাগিটা গোড়াতে হ'ল তিন ধরণের মূল কাজের ভিত্তিতে। সমাজের মাথায় স্থান হ'ল তাদের যারা দেবতাদের সন্তুষ্ট রাখার কাজ করবে, প্রকৃতিকে খুশী রাখবে আর আবহাওয়ার খবরাখবর দিয়ে কৃষকদের কাজে সহায়তা করবে। অনার্যদের সঙ্গে এবং নিজেদের মধ্যেকার সমস্ত রকম সংঘর্ষের মোকবিলা করবে ক্ষত্রিয়রা,—শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্বও তাদের। কৃষিকাজ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের তদারকি করবে বৈশ্যরা। এইভাবেই বিজিত অনার্য ও বিজেতা আর্যদের নিয়ে গড়ে ওঠা বৃহত্তর আর্যসমাজ পেশার ভিত্তিতে চারটি প্রধান বর্ণ বা শ্রেণীতে ভাগ হয়ে গেল।

আর্যরা ব্যক্তিগত জীবনেও কতকগুলি নিয়ম মেনে চলত। প্রথম জীবনে তারা গুরুর কাছে বিদ্যাভ্যাস করত—ভবিষ্যৎ পেশার উপযোগী করে নিজেদের তৈরী করে নিত। এই পর্যায়কে বলা হত ব্রহ্মচর্য। এরপর বিবাহ করে তারা সংসারী হ'ত। এ পর্যায়কে বলা হত গার্হস্থ। বানপ্রস্থের পর্যায়ে তারা গৃহজীবন থেকে নিজেদের মুক্ত করে আনত এবং সন্ন্যাস পর্যায় কাটাত তারা অধ্যাত্ম-চিন্তার মধ্য দিয়ে।

আর্যদের সমাজের মূল ভিত্তি ছিল পরিবার। পরিবারের কর্তাকে বলা হ'ত গৃহপতি। সমাজে ছিল পুরুষদের প্রাধান্য তবে মেয়েদের মর্যাদাও যথাযথভাবে রক্ষা করা হ'ত। পুরুষদের মত মেয়েদেরও শিক্ষার অবাধ অধিকার ছিল।

আর্যদের প্রধান খাদ্য ছিল শস্য, সব্জী, দুধ, ফল, পিঠা, মাংস ইত্যাদি। পানীয় ছিল সোমরস বা সুরা। তুলা, পশম বা চামড়া দিয়ে তাদের পোশাক তৈরী হ'ত। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই

সোনা ও ফুলের অলঙ্কার দিয়ে দেহসজ্জা করত, মাথায় পরত পাগড়ী। রথচালনা, শিকার, নৃত্য—এসব ছিল তাদের চিত্ত-বিনোদনের মাধ্যম।

আর্য-সভ্যতা প্রধানত গ্রামীন ধরণের হলেও ঐ সময়ের সাহিত্যে নগরের উল্লেখও পাওয়া যায়। কৃষিকর্ম ও পশুপালন ছিল প্রধান জীবিকা। উৎপাদন বাড়ানোর জন্য জলসেচন ও সার-প্রয়োগের রীতি তাদের আজানা ছিল না। চারণ-ভূমি ছিল সকলের সাধারণ সম্পত্তি, যদিও কৃষি জমির উপর ব্যক্তি মালিকানার চলন ছিল। গরু ছিল বিনিময়ের মাধ্যম—গরুর মূল্যে সকল জিনিষেরই মূল্য স্থির করা হ'ত। মৃৎশিল্প, ধাতুশিল্প, বয়নশিল্প ও দারুশিল্পে আর্য কারিগরদের দক্ষতা ছিল।

আর্যদের রাষ্ট্রীক জীবনের মূল ভিত্তি ছিল পরিবার। কয়েকটি পরিবার নিয়ে গড়ে উঠত একটি গ্রাম। গ্রামের প্রধানকে বলা হ'ত গ্রামনী। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গড়ে উঠত একটি বিশ বা জন। এই গ্রাম-সমষ্টির প্রধানকে বলা হ'ত বিশপতি, রাজন বা রাজা। জন-এর সবাই যাতে নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলে এটা দেখা ছিল রাজার কর্তব্য। জন-এর সকলের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা রক্ষা করাও ছিল রাজার কর্তব্য। সভা ও সমিতি নামক দুটি প্রতিনিধি সভা রাজাকে সকল বিষয়ে পরামর্শ দিত। যুদ্ধ পরিচালনা করত সেনাপতি। পুরোহিত ধর্ম-পালন সম্বন্ধে নির্দেশ দিত এবং রাজার মন্ত্রীর কাজ করত। যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র ছিল তীর-ধনুক। অনেক রাজা অন্য রাজাদের পরাজিত করে একরাট বা সম্রাট উপাধি নিতেন। বিভিন্ন বিষয়ে রাজাকে সাহায্য করার জন্য অনেক কর্মচারী নিযুক্ত থাকতেন।

চতুর্থ পাঠ : মহাকাব্য

বেদের পরে রচিত হয় রামায়ণ ও মহাভারত। কথকরা গেয়ে শোনাত রাম-সীতা ও পঞ্চপাণ্ডবের উপাখ্যান। এই দুই মহাকাব্যের ভিতর দিয়ে কতগুলি উজ্জ্বল জাবনাদর্শ তুলে ধরা হয়েছে। রামায়ণে

মহাবীর রাবণের পতন, ন্যায়ের জয় হবেই এই সত্য প্রচার করছে। মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আমাদের শিক্ষা দেয় যে ন্যায়ের জন্য অস্ত্র ধারণ করা মানুষের ধর্ম। এই মহাকাব্যের যুগে বৈদিক আর্যসমাজের মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছে তার রূপও ফুটে উঠেছে মহাকাব্য দুটিতে। রাজ্য পরিচালনায় ক্ষমতার হাতবদল হয়েছে—ব্রাহ্মণদের স্থান নিয়েছে ক্ষত্রিয়রা। স্ত্রী-স্বাধীনতা খর্ব হয়েছে—মহিলাদেব স্থান হয়েছে অন্তঃপুরে। এইভাবেই চলতি সমাজ-ব্যবস্থার বহু খুঁটিনাটি তথ্য পাওয়া যায় এই দুটি মহাকাব্য থেকে।

পঞ্চম পাঠঃ ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন—জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম

বেদ রচনার পর অনেক শতাব্দী কেটে গেছে। ব্রাহ্মণ আর পুরোহিতদের হাতে পড়ে বৈদিক ধর্মের সহজ, সরল, অনাড়ম্বর রূপটি নষ্ট হয়ে গেছে। ধর্ম হয়ে উঠেছে ব্যয়বহুল, জাঁকজমকপূর্ণ কতকগুলি বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান। জাতিভেদ প্রথার কড়াকড়ি বেড়ে গেছে। ফলে অনেক মানুষ এই ধর্মের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলল। প্রচলিত ধর্মের সংস্কারের দাবী প্রবল হয়ে উঠল। এই সংস্কার আন্দোলনের নেতৃত্বে এল ক্ষত্রিয়রা। শতাধিক ভিন্ন ধরণের মতবাদ দেখা দিল। এর মধ্যে প্রবল হয়ে উঠল জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের মতবাদ।

জৈনধর্মের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রচারক মহাবীরের জন্ম হয় উত্তর বিহারের বৈশালীর এক ক্ষত্রিয় পরিবারে। ত্রিশ বছর বয়সে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং বারো বছর কঠোর তপস্যার পর দিব্যজ্ঞান লাভ করে 'জিন' বা 'মহাবীর' নামে পরিচিত হন। তাঁর অনুগামীরা খ্যাত হন জৈন নামে। এরপর প্রায় ত্রিশ বছর তিনি উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাঁর ধর্মমত প্রচার করেন। সমমতাবলম্বী আরো তেইশজন জৈন গুরুর মতাদর্শকে তিনি সমৃদ্ধ করেন। তাঁর উপদেশ হ'ল ইন্দ্রিয়ের বন্ধন থেকে মানুষ যদি নিজেকে মুক্ত করতে পারে

তাহ'লেই আসে তার আসল মুক্তি। এই মুক্তি লাভের পথ হ'ল জ্ঞান, বিশ্বাস ও সদাচার। তিনি ব্রহ্মচর্য, অহিংসা, আত্মপীড়ন ও কৃচ্ছতা পালনের নির্দেশ দেন। তাঁর উপদেশগুলি 'পূর্ব' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধের জন্ম হয় খৃষ্টপূর্ব ৫৬৬ বা ৬২৪ অব্দে নেপালের কপিলাবস্তু নগরের রাজ পরিবারে। অল্প বয়সে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং শাস্ত্র পাঠ ও তপশ্চর্যার মধ্য দিয়ে পরম সত্যের সন্ধান করেন। দীর্ঘ সাধনার পর তিনি বোধি বা দিব্যজ্ঞান লাভ করেন এবং বুদ্ধ নামে পরিচিত হন। এরপর তিনি উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে ধর্ম প্রচার শুরু করেন। সমসাময়িক কয়েকজন শক্তিশালী রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর ধর্মমত খুব দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

বুদ্ধ

বুদ্ধের ধর্মমত ছিল সহজ ও যুক্তিনির্ভর। তাঁর লক্ষ্য ছিল পার্থিব সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে মানুষকে মুক্ত করা। তাঁর মতে এই দুঃখের কারণ হ'ল মানুষের কামনা বাসনা। সুতরাং দুঃখ-যন্ত্রণা

এড়াবার উপায় হ'ল মনকে কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত করা। এই বাসনা মুক্তির আটটি উপায় তিনি নির্দিষ্ট করেছেন। একে বলা হয় অষ্টাঙ্গিক মার্গ, তাঁর উপদেশ ছিল চরম ভোগবিলাস বা কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়ে মুক্তি লাভ করা যায় না। এই দুই-এর মাঝামাঝি মধ্যম পথই মুক্তি লাভের শ্রেষ্ঠ পথ। এজন্য প্রয়োজন সহজ সংযত জীবন যাত্রা অনুসরণ করা। তাঁর ধর্মমতে দেবদেবী, যাগযজ্ঞ, পশুবলি, জাতিভেদের কোন স্থান নেই। অহিংসা ছিল তাঁর মূলমন্ত্র।

বুদ্ধের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যরা তাঁর উপদেশগুলি গ্রন্থাকারে সঙ্কলিত করেন। যে ধর্মগ্রন্থ তৈরী হ'ল তার নাম ত্রিপিটক। তিনি 'বুদ্ধ সংঘ' নামে ধর্ম মহাসংঘ গড়ে তুলেছিলেন।

ষষ্ঠ পাঠ : সাম্রাজ্য-বিকাশের যুগ

বিভিন্ন বৈদিক সাহিত্য থেকে জানা যায় যে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধে ভারতে রাজতন্ত্র অথবা গণতন্ত্র-শাসিত ষোলটি রাজ্য বা মহাজন পদ ছিল। এগুলির মধ্যে কোন ঐক্য ছিল না, ছিল প্রভাব-বিস্তারের কঠোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই পদ্ধতির মধ্য দিয়ে প্রথমদিকে কুরু ও পাঞ্চাল বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই শতকেরই শেষদিকে ধীরে ধীরে অবন্তী, বৎস, কোশল ও মগধ শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। শেষে সবচেয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে মগধ এবং কালক্রমে এই মগধের নেতৃত্বেই ভারতে প্রথম একটি সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে।

হর্যঙ্ক বংশের রাজা বিম্বিসারের নেতৃত্বে প্রথম মগধ উত্তর ভারতের রাজনীতিতে তার শক্তি ও মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি করে। পরবর্তী শাসক অজাতশত্রুর আমলে মগধের প্রতিপত্তি আরও বৃদ্ধি পায়। বেশ কয়েকটি দুর্বল রাজ্য মগধের দখলে আসে।

হর্যঙ্কবংশের পরবর্তী রাজাদের দুর্বলতার সুযোগে প্রথমে মন্ত্রী শিশুনাগ, পরে তাঁর পুত্র কালাশোক মগধের রাজা হন। এরপর মহাপদ্ম নন্দ মগধের সিংহাসনে নন্দবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

মহাপদ্ম নন্দ বা উগ্রসেন ছিলেন শক্তিশালী শাসক। তাঁর নেতৃত্বে মগধের আকার, আয়তন ও কর্তৃত্ব অনেক বৃদ্ধি পায়। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিরাট অংশ নিয়ে এই প্রথম একটি সাম্রাজ্য স্থাপিত হ'ল। এরপর আরো আটজন নন্দ বংশীয় রাজা মগধের সিংহাসনে বসেন। সর্বশেষ শাসক ধননন্দকে পরাজিত করে মগধ দখল করে নেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য যে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন তার নাম হয় মৌর্যবংশ। এই বংশের রাজত্বকালে মগধের গৌরবের যুগ শুরু হয়।

মগধ দখলে এনে চন্দ্রগুপ্ত প্রথমেই উত্তর-পশ্চিম ভারতের উপজাতিগুলিকে একত্র করে ঐ অঞ্চলের উপর গড়ে-ওঠা গ্রীক আধিপত্য ধ্বংস করেন। এরপর চন্দ্রগুপ্ত দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের কয়েকটি রাজ্য দখল করেন। এই সময় তিনি দ্বিতীয়বার গ্রীকশক্তির
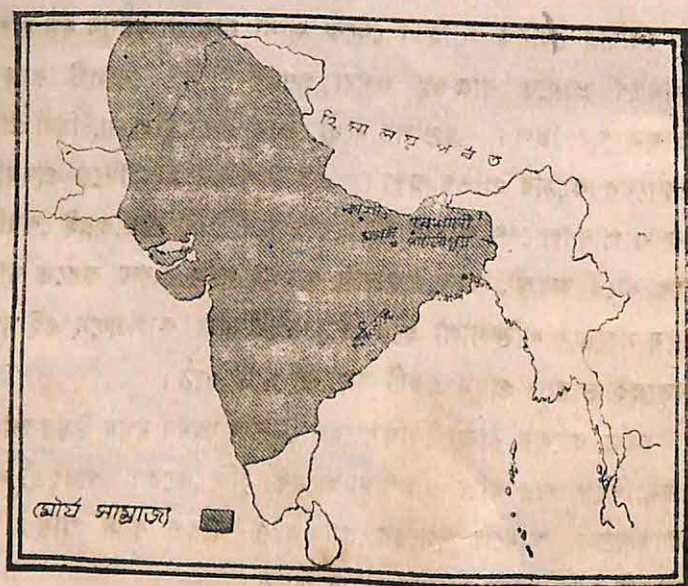
মোকাবিলা করেন। এভাবে পশ্চিমে আরবসাগর থেকে পূর্বে বঙ্গোপসাগর, উত্তর-পশ্চিমে পারস্য থেকে দক্ষিণে মহীশূর পর্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। গ্রীক-শাসক সেলুকস

চন্দ্রগুপ্তের বন্ধুত্ব কামনা করে তাঁর রাজসভায় মেগাস্থিনিস নামে এক দূত প্রেরণ করেন।

এরপর রাজা হন বিন্দুসার। বিন্দুসারের পর তাঁর পুত্র অশোক মগধের সম্রাট হন। রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি এক নূতন আদর্শ প্রচার করলেন। তাঁর মতে যুদ্ধ জয় নয়, প্রজাপালনই রাজার প্রধান কর্তব্য। প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সঙ্গে তিনি মৈত্রী ও সহাবস্থানের সম্পর্ক গড়ে তুললেন। এক উদার মানবতাবাদী আদর্শের প্রচার করলেন তিনি দেশে বিদেশে দূত পাঠিয়ে। শাসক ও শাসিতের মধ্যে প্রচলিত সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটিয়ে তিনি এক দুঃসাহসিক প্রয়াস চালালেন এবং এ বিষয়ে যথেষ্ট কৃতকার্য হলেন। ধর্ম-বিশ্বাসের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন বৌদ্ধ।

সম্রাট অশোক

তাঁর মৃত্যুর পর একশো বছরের মধ্যেই মৌর্য সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে। সাম্রাজ্যের মধ্যে এখানে ওখানে ছোট-বড় অনেক স্বাধীন রাজ্যের সৃষ্টি হয়। এই রাজ্যগুলির পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদের মধ্য দিয়ে উত্তর ভারতের রাজনীতিতে সৃষ্টি হয় এক অস্থির পরিবেশের। সেই সুযোগে শুরু হয় বৈদেশিক আক্রমণ।

এই সময়ে যে সব বিদেশী জাতি ভারতে অভিযান পরিচালনা করে তাদের মধ্যে সবশেষে আসে কুষাণ-শাসকরা। কুষাণ শাসক প্রথম কদ্‌ফিস্ মধ্য এশিয়া থেকে ভারত সীমান্ত পর্যন্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পুত্র দ্বিতীয় কদ্‌ফিস ভারতের অভ্যন্তরে বারাণসী পর্যন্ত সাম্রাজ্য প্রসারিত করেন।

কুষাণ-শাসকদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন কনিষ্ক। তিনি সামরিক অভিযান পরিচালনা করে ভারতের ভিতরে ও বাহিরে একটি

বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। তাঁর নামাঙ্কিত মুদ্রা বঙ্গদেশে পর্যন্ত পাওয়া যায়। তাঁর রাজধানী ছিল পুরুষপুর বা পেশোয়ার। তিনি ছিলেন বিদ্যোৎসাহী ও শিল্পানুরাগী শাসক। তক্ষশীলার নিকট তিনি একটি নগরী নির্মাণ করান। তাঁর রাজসভায় সে যুগের বহু জ্ঞানীগুণীর সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। বৌদ্ধ ধর্মের আভ্যন্তরীন গোলযোগের নিষ্পত্তির জন্য তিনি একটি বৌদ্ধ মহাসম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর ধীরে ধীরে বিশাল কুষাণ সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর শক, পহ্লব, কুষাণ প্রভৃতি বিদেশী জাতিগুলির আক্রমণে ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য বিনষ্ট হয়। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্তবংশের উত্থানের মধ্য দিয়ে মগধকে কেন্দ্র করে আবার এক শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে।

গুপ্তবংশের প্রথম সার্বভৌম নরপতি হলেন প্রথম চন্দ্রগুপ্ত। সম্ভবত ৩২০ খৃষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। উত্তর ভারতের শক্তিশালী রাজার সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে এবং কয়েকটি রাজ্য জয় করে তিনি মগধের শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।

পরবর্তী শাসক সমুদ্রগুপ্ত হলেন গুপ্তবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তিন পর্যায়ে তিনি সমগ্র ভারতকে এক রাজশক্তির অধীনে আনার প্রয়াস শুরু করেন। প্রথম পর্যায়ে তিনি উত্তর ভারতের ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলি দখলে আনেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি মধ্য ভারতের অরণ্য রাজ্যগুলির উপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে দক্ষিণ ভারতের ত্রিচিনপল্লী পর্যন্ত সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। রাজধানী পাটলিপুত্র থেকে দূরবর্তী দক্ষিণের রাজ্যগুলি প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে রাখা

সমুদ্রগুপ্ত

কঠিন মনে করে তিনি দক্ষিণের রাজাদের আনুগত্য আদায় করেই সরাসরি দখলে আনা থেকে বিরত থাকেন। তৃতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সীমান্ত রাজ্যগুলির সঙ্গে তিনি অধীনতামূলক মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপন করেন। এভাবে ব্রহ্মপুত্র থেকে চম্বল, হিমালয় থেকে নর্মদা পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয় সমুদ্রগুপ্তের আধিপত্য।

এই বংশের অপর বিখ্যাত সম্রাট হলেন পরবর্তী শাসক সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য। পিতার সাম্রাজ্যের সীমানা তিনি আরো প্রসারিত করেন। তবে তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব পশ্চিম ভারতে শক আধিপত্যের অবসান ঘটানো। পিতার মতই তিনিও ছিলেন দক্ষ যোদ্ধা ও শাসক, বিদ্যোৎসাহী ও শিল্পানুরাগী।

পরবর্তী শাসকগণ যথাক্রমে কুমারগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের আকার আয়তন মোটামুটি অক্ষত রাখেন। স্কন্দগুপ্ত দুর্ধর্ষ হূণ জাতির আক্রমণের মোকাবিলা করেন। অবশ্য স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পরই গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয় এবং ভারতের রাজনীতিতে আবার অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

সপ্তম পাঠ : বাংলার ইতিকথা

প্রাচীনকালে বাংলাদেশ বলতে কয়েকটি জনপদকে বোঝান হত। এই জনপদগুলি আসলে ছিল ভিন্ন ভিন্ন কতকগুলি উপজাতি অধ্যুষিত স্বাধীন রাজ্য। প্রাচীন পুঁথি থেকে এরকম কতকগুলি জনপদের নাম পাওয়া যায়, যেমন—বঙ্গ, হরিকেল ও সমতট, বঙ্গাল, পুণ্ড্র, বরেন্দ্রী, উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়, তাম্রলিপ্ত, গৌড় প্রভৃতি। বৈদিক যুগের আর্যরা এসব অঞ্চলের অধিবাসীদের 'দস্যু' আখ্যা দিয়েছিল।

এরপর আলেকজাণ্ডারের অনুগামী গ্রীক ঐতিহাসিকগণ তাঁদের লেখায় ভারতের পূর্বদিকে গঙ্গারিদাই নামে একটি শক্তিশালী রাজ্যের উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত গঙ্গানদীর মোহনার কাছে যে জাতি বাস করত তাদেরই গঙ্গারিদাই জাতি বলা হয়েছে।

মৌর্যযুগের পর উত্তর ভারতে চলতে থাকে রাজনৈতিক অস্থিরতা। সে সময় বাংলার অবস্থা কি রকম ছিল তা' সঠিক জানা যায় না। গুপ্তযুগে আবার বাংলার উল্লেখ পাওয়া যায়। চীনা পরিব্রাজক ইৎ-সিং-কে অনুসরণ করে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে গুপ্তসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীগুপ্তের আদি বাসস্থান ছিল বাংলাদেশের মুর্শিদাবাদ অথবা মালদহ জেলায়। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটি শক্তিশালী অঙ্গরাজ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। অবশ্য গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর বাংলাদেশের ছোট-বড় সামন্ত রাজারাও স্বাধীন হয়ে যান।

অষ্টম পাঠ ঃ ভারত ও প্রতিবেশী দেশসমূহ

মৌর্যযুগ থেকেই প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে ভারতের যোগাযোগের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। অশোকের ধর্মপ্রচারকেরা দক্ষিণ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, মিশর, আফ্রিকা ও ইউরোপ পর্যন্ত অশোকের বাণী বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। গ্রীক গ্রন্থে পাশ্চাত্য দেশগুলির সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক যোগাযোগের উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের বার্তা নিয়ে, বাণিজ্য-সম্ভার নিয়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, যবদ্বীপ, মালয় উপদ্বীপ, শ্যামদেশ, ব্রহ্মদেশ, তিব্বত, সিংহল প্রভৃতি দেশে যাতায়াত শুরু করে। পরে যুদ্ধজয় অথবা অন্যভাবে এই অঞ্চলগুলির উপর ভারতের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হয়। এই সাময়িক নিয়ন্ত্রণ অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কিন্তু সাংস্কৃতিক প্রভাব বজায় থেকে যায়।

মধ্য এশিয়া এই কথাটির দ্বারা ঐতিহাসিকেরা বর্তমান পূর্ব-তুর্কীস্থানকে বোঝান। এই অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে। কুষাণ সম্রাটগণের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারকগণ বৌদ্ধধর্মকে কাস্পিয়ান সাগরের তীর থেকে চীনের মহাপ্রাচীর পর্যন্ত প্রসারিত অঞ্চলের যাযাবর জাতিগুলির কাছে

জনপ্রিয় করে তোলেন। বর্তমান খোটানের চারদিকে অসংখ্য ভারতীয় উপনিবেশ গড়ে তোলা হয়েছিল। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ স্যার অরেলষ্টাইন মধ্য এশিয়া ও বেলুচিস্থানের বিভিন্ন স্থানে খননকার্য চালিয়ে বহু বৌদ্ধস্তূপ, বৌদ্ধ ও হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি, ভারতীয় ভাষায় রচিত বহু লিপি ও পুঁথি আবিষ্কার করেন। এই সকল অঞ্চল থেকে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি চীন, জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে।

নবম পাঠ : মেগাস্থিনিস ও ফা-হিয়েনের বিবরণ

গ্রীক সেনাপতি সেলুকস চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় মেগাস্থিনিসকে দূত হিসাবে পাঠান। তিনি মৌর্য শাসন পদ্ধতি ও ভারতীয় জনসমাজ সম্বন্ধে একটি বিবরণী রচনা করেন যার নাম 'ইণ্ডিকা'।

মেগাস্থিনিসের মতে ভারতীয় সমাজ দার্শনিক, কৃষক, পশুপালক, শিল্পী, সৈনিক, পরিদর্শক ও অমাত্য এই সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। শ্রেণীভেদের কঠোরতা ছিল। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ছিল সরল ও সাদাসিধে। তাদের নৈতিক মান ছিল উন্নত। দেশে চুরি ডাকাতি ছিল না। মানুষে মানুষে সম্পর্ক ছিল সহৃদয় ও বন্ধুত্বপূর্ণ। মেগাস্থিনিসের মতে ভারতে তখন দাস প্রথা ছিল না। তবে সমসাময়িক সাহিত্য ও অন্যান্য সূত্র থেকে জানা যায় যে দাসপ্রথা ছিল তবে তা সম্ভবত গ্রীকদেশের মত অত কঠোর ছিল না।

কৃষি ও পশুপালন ছিল প্রধান জীবিকা। জমি ছিল উর্বর। জলসেচের ভাল ব্যবস্থা ছিল। রাজকর্মচারীরা কৃষকদের উপর অত্যাচার করতেন না। শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যেও ভারতীয়রা যথেষ্ট উন্নত ছিল, কৃষকদের অবস্থা ছিল ভাল। খাদ্য-সামগ্রীর অভাব ছিল না।

চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ভারতে আসেন গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে। তিনিও তৎকালীন ভারতে অবস্থা নিয়ে বিবরণী রচনা করেন। পাটলিপুত্রে তিনি তিন বছর অবস্থান করেন।

এই নগরীর অধিবাসীদের জীবন যাত্রার ধরণের তিনি প্রশংসা করেন। প্রশংসা করেন তাদের দানশীলতার। এখানে বহু দাতব্য চিকিৎসালয় ও অনাথ আশ্রম ছিল। গয়া, শ্রাবস্তী, কুশীনগর, কপিলাবস্তু ইত্যাদি নগরগুলি ছিল জনবিরল। তবে উজ্জয়িণীতে বহু লোক বাস করত। জনসাধারণের মধ্যে বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় ধর্মমতই প্রচারিত ছিল। সাম্প্রদায়িক মনোভাব ছিল না। জনসাধারণ ছিল সুখী ও সমৃদ্ধ। চোর-ডাকাতের উপদ্রব ছিল না। রাজকর্মচারীরা জনসাধারণের প্রতি সদয় ব্যবহার করতেন।

দশম পাঠ : প্রাচীন ভারতীয় শিল্প-স্থাপত্য, সাহিত্য-শিক্ষা ও বিজ্ঞান

মৌর্যযুগেই ভারতের শিল্পকলার প্রকৃত বিকাশ শুরু হয়। এই সময় কাষ্ঠের পরিবর্তে প্রস্তর শিল্পের প্রচলন হয়। অশোকের প্রস্তর-নির্মিত প্রসাদের ধ্বংসস্তূপ দেখে পর্যটক ফা-হিয়েন বিস্ময়ে বলেছেন, 'ইহা মানবের দ্বারা নয় দানবের দ্বারা নির্মিত'। অশোকের সময় অসংখ্য শিলাস্তূপ ও স্তম্ভ নির্মিত হয়। সেগুলির অলংকরণ ও স্তম্ভচূড়ার মূর্তিগুলি খুব উন্নত শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়।

কুষাণ আমলে ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ভারতীয় ও গ্রীক ভাস্কর্য রীতির সমন্বয়ে এক নতুন ভাস্কর্যরীতির উদ্ভব হয়, যার নাম গান্ধার শিল্প। এই শিল্পরীতিতে ভারতীয় ভাবাদর্শ ও গ্রীক শিল্প কৌশলের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটানো হয়। মথুরা, অমরাবতী প্রভৃতি ভারতীয় কলা-কেন্দ্রগুলিতে এই শিল্পরীতির ব্যাপক চর্চা চলতে থাকে।

গুপ্তযুগে স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলায় ও ধাতুশিল্পে ভারতীয় প্রতিভার চরম বিকাশ ঘটেছিল। অজন্তা ও বাঘগুহার চিত্রাবলী এবং দিল্লীর চন্দ্ররাজার লৌহস্তম্ভ এযুগের শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

'বুদ্ধচরিত' রচয়িতা অশ্বঘোষ ও দার্শনিক বসুমিত্র কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের সভাসদ ছিলেন। তবে ভারতীয় সাহিত্যের সুবর্ণযুগ হ'ল গুপ্তযুগ। এই সময়েই কালিদাস তাঁর অমর কাব্য ও নাটকগুলো রচনা

করেন। তাঁর রচিত 'কুমারসম্ভব', 'মেঘদূত', 'রঘুবংশ', 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্', 'ঋতুসংহার', প্রভৃতি কাব্য ও নাটক বিশ্বসাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের রচয়িতা শূদ্রক ও 'মুদ্রারাক্ষস' রচয়িতা বিশাখদত্ত, পঞ্চতন্ত্র রচয়িতা বিষ্ণুশর্মন এযুগেই তাঁদের নাটক গল্পগুলি রচনা করেন। বৌদ্ধ-দার্শনিক অসঙ্গ ও বসুবন্ধু এযুগেই আবির্ভূত হন। এযুগে রামায়ণ, মহাভারত সমেত বহু পুরাণ স্মৃতিশাস্ত্রের গ্রন্থ সংকলিত হয়।

প্রাচীন ভারতের দুটি বৃহৎ শিক্ষাকেন্দ্র ছিল তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয় ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত এক হাজার বছরব্যাপী এই বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের প্রাণ চঞ্চল শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে চালু ছিল। চীন, ইরান, আফগানিস্তান, গ্রীস প্রভৃতি দেশ থেকে শিক্ষার্থীর সমাবেশ ঘটতো এখানে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি, দর্শন, সাহিত্য, ব্যাকরণ, বিজ্ঞান ও গণিত পড়ানো হত। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি ছিল সমগ্র এশিয়া ভূখণ্ড জুড়ে। দেশ বিদেশের অসংখ্য বিদ্যার্থী এখানে সমবেত হতেন। বৌদ্ধ শাস্ত্র ও দর্শন ছাড়া অন্যান্য পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে ছিল ধর্ম, দর্শন, গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নৈতিক চরিত্রে ও পাণ্ডিত্যে দেশের আদর্শ ব্যক্তি বলে গণ্য হতেন।

জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, রসায়ণ-বিজ্ঞানের এই শাখাগুলিতে প্রতিভার চরম বিকাশ ঘটে গুপ্তযুগে। আর্যভট্ট তাঁর 'সূর্য-সিদ্ধান্ত' গ্রন্থে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন। তিনি গ্রহ উপগ্রহগুলির অবস্থান সম্বন্ধেও গবেষণা করেন। বরাহমিহির-রচিত 'বৃহৎ-সংহিতা' ও 'পঞ্চসিদ্ধান্ত' নামক গ্রন্থদুটি জ্যোতির্বিজ্ঞানের অমূল্য সম্পদ। চিকিৎসাশাস্ত্রেও এযুগে প্রভূত উন্নতি লাভ করে। শল্য-চিকিৎসা সম্ভবত এযুগে প্রচলিত ছিল। বিখ্যাত শল্যবিদ্ 'সুশ্রুত' সম্ভবত এযুগের মানুষ ছিলেন।

—:o:—

প্রশ্নাবলী

প্রথম অধ্যায়

দু-এক কথায় উত্তর দাও :—

১। পৃথিবীতে মানুষ এসেছে আনুমানিক কত বৎসর আগে ?

২। মানুষ লিখতে শিখেছে কত বছর আগে ?

সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :—

১। মানুষ সমাজবদ্ধ হয়েছিল কেন ?

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন :—

১। মানুষ যখন লিখতে জানত না, সেই যুগের মানুষের ইতিহাস কিভাবে জানা যায় ?

দ্বিতীয় অধ্যায়

দু-এক কথায় উত্তর দাও :—

১। বানরের আকৃতির প্রথম মানুষের সন্ধান কোথায় পাওয়া যায় ?

২। কোন যুগের লোক সর্বপ্রথম কৃষিকাজের কৌশল আবিষ্কার করেছিল ?

৩। কৃষিকাজের প্রথম নিদর্শন কোন দেশে পাওয়া গেছে ?

৪। মানুষ কোন যুগে প্রথম পশুপালন শুরু করে।

৫। বয়নশিল্প কোন যুগের মানুষ আবিষ্কার করে ?

৬। শস্য রাজার পূজা কখন প্রচলিত ছিল ?

সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :—

১। কৃষি ও পশুপালন আবিষ্কারের ফলে মানুষের জীবনযাত্রার কি পরিবর্তন হয় ?

২। যাযাবর মানুষ স্থায়ীভাবে বাস করতে আরম্ভ করল কেন ?

৩। কিভাবে ভাষার সৃষ্টি হয় ?

তৃতীয় অধ্যায়

দু-এক কথায় উত্তর দাও :—

১। মানুষ সর্বপ্রথম কোন ধাতুর ব্যবহার শেখে ?

২। কোন অঞ্চলের বসবাসকারী লোকেরা প্রথম সভ্য হয়ে ওঠে ?

১৩। প্রতি চার বছর অন্তর খেলাধূলার জন্য গ্রীকরা কোথায় মিলিত হতেন?
১৪। কার যুগকে এথেন্সের 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়?
১৫। অ্যাথিনার মূর্তি কে তৈরী করেন?
১৬। আলেকজাণ্ডারের শিক্ষকের নাম কি?
১৭। রোম নগরী কে প্রতিষ্ঠা করেন?
১৮। হ্যানিবলকে কে যুদ্ধে পরাজিত করেন।
১৯। সাঙবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?
২০। চীন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কে করেন?
২১। আর্যরা কখন ভারতে আসেন?
২২। বুদ্ধদেব কোথায় সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেন?
২৩। বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থের নাম কি?
২৪। কোন গুপ্ত সম্রাট হূণদের পরাজিত করেন?
২৫। ফা-হিয়েন কার সময়ে ভারত ভ্রমণে আসেন?

প্রশ্ন উত্তর দাও :—

১। কিভাবে ইস্পাতের তৈরী অস্ত্র-শস্ত্রের প্রচলন হয়?
২। লোহার প্রচলন কিভাবে শ্রমিক ও কৃষকের আর্থিক অবস্থা উন্নত করে?
৩। ব্যাবিলন সভ্যতার পুরোহিতদের প্রতিপত্তি সংক্ষেপে লেখ।
৪। হামুরাবির সময়ে সমাজে কয় শ্রেণীর লোক বাস করত? বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের বিচার-ব্যবস্থা কিভাবে পরিচালিত হত?
৫। হিকসস্‌দের কাছে মিশরবাসীরা কেন পরাজিত হয়?
৬। ইহুদীদের ধর্মগুরুর নাম কি? তাঁর ধর্মমত সংক্ষেপে বল।
। গ্রীসে কোন নগর রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল?
হেরোডোটাস কিভাবে ইতিহাস লিখেছেন?
সক্রেটিস কিভাবে শিক্ষা দিতেন?
আলেকজাণ্ডার ভারতে প্রবেশ করেননি কেন?
। রোমের সঙ্গে কার্থেজের যুদ্ধের সর্বপ্রধান কারণ কি?
২। সিজারকে কারা কি কারণে হত্যা করেছিল?
৩। রোমান সাম্রাজ্যে কিভাবে খ্রীস্টানধর্ম প্রচারিত হয়?
৪। কনফুসিয়াস কি কি উপদেশ দিয়েছেন?

১৫। চতুরাশ্রম কাকে বলে ?

১৬। মহাবীরের প্রধান উপদেশগুলি কি কি ?

১৭। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সাম্রাজ্য কত দূর বিস্তৃত ছিল ?

১৮। অশোকের 'ধর্মবিজয়' বলতে কি বোঝ ?

১৯। মেগাস্থিনিস ভারতের সমাজে কয় শ্রেণীর মানুষের উল্লেখ করেছেন ?

২০। গান্ধারশিল্প কাকে বলে ?

২১। প্রাচীন ভারতের দুজন বিজ্ঞানীর নাম কর। তাঁরা কি জন্য বিখ্যাত

২২। তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে কি জান ?

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন :—

১। লোহার প্রচলন মানব সমাজের কি কি পরিবর্তন এনে দেয় ?

২। ব্যাবিলনবাসীদের কৃষি ও বাণিজ্য সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে বল।

৩। আহমোস্ বংশের নেতৃত্বে মিশরের অভ্যুত্থান আলোচনা কর।

৪। জরথুষ্ট্রের ধর্মমত সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৫। ফ্যারাও-এর অত্যাচার থেকে ইহুদীদের কে কিভাবে রক্ষা করেন ?

৬। হোমারের সাহিত্য থেকে প্রাচীন গ্রীসের কি পরিচয় পাওয়া যায় ?

৭। পেরিক্লিসের যুগকে এথেন্সের স্বর্ণযুগ বলা হয় কেন ?

৮। আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয় কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৯। রোম কার্থেজের মধ্যে বিবাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

১০। রোমের দাস বিদ্রোহ ও তার ফলাফল সংক্ষেপে আলোচনা কর।

১১। যীশুখ্রীস্ট কিভাবে ধর্মপ্রচার করতেন ? তাঁকে কারা কি কারণে
করেছিল ?

১২। কনফুসিয়াসের আমলে চীনের মানুষ কেন দুর্দশাগ্রস্ত হয় ? কনফুসি
কিভাবে দেশের দুর্গতি দূর করতে চেয়েছিলেন ?

১৩। বৈদিক যুগে সমাজ ও শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে যা জান লেখ।

১৪। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কিভাবে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন ?

১৫। অশোককে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলা হয় কেন ?

১৬। সমুদ্রগুপ্তের কৃতিত্ব সংক্ষেপে আলোচনা কর।

১৭। গুপ্তযুগের শিল্প ও সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

১৮। ফা-হিয়েন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কি বিবরণ রেখে গেছেন ?

সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :—

১। শহরের সৃষ্টি কিভাবে সম্ভব হয়েছিল ?
২। সমাজ শ্রেণী বিভাগের সূচনা কিভাবে শুরু হয় ?
৩। রাজা নামক শক্তিমান শাসকের আবির্ভাব কেন হল ?
৪। ব্রোঞ্জযুগে ছোটবড় রাজ্য গড়ে উঠল কেন ?

চতুর্থ অধ্যায়

দু-এক কথায় উত্তর দাও :—

১। মেসোপটেমিয়া কোন দুই নদীর তীরে অবস্থিত ?
২। সুমেরীয়গণ কিসের পূজা করত ?
৩। সুমেরীয়দের একটি প্রাচীন শহরের নাম কর।
৪। সুমেরীয়দের লিপিকে কি লিপি বলা হয় ?
৫। মিশর দেশটি কোথায় ?
৬। মিশরের প্রধান সম্পদ কি ?
৭। মিশরকে কে প্রথম ঐক্যবদ্ধ করেন ?
৮। ফ্যারাওদের পাথরের তৈরী কবরের নাম কি ?
৯। প্রাচীন মিশরের সংরক্ষিত মৃতদেহকে কি বলা হয় ?
১০। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা কোন রাজ্যে অবস্থিত ?
১১। মহেঞ্জোদড়ো সভ্যতা কোন সভ্যতার সমসাময়িক ?
১২। সিন্ধু-সভ্যতা আনুমানিক কোন সময়ে ধ্বংস হয় ?
১৩। চীন দেশের আদি সভ্যতা কোন অঞ্চলে গড়ে উঠে ?

সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :—

১। মেসোপটেমিয়া কি কি কারণে আদি মানব-সভ্যতার একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল ?
২। সুমেরীয়গণ কিভাবে বাড়ী তৈরী করত ?
৩। সুমেরীয় সমাজে পুরোহিতদের ক্ষমতার বিবরণ দাও।
৪। মিশরবাসীদের জীবনে নীলনদের গুরুত্ব সংক্ষেপে বল।
৫। ফ্যারাওদের ক্ষমতার বিবরণ দাও।

৬। প্রাচীন মিশরে কৃষকরা কিভাবে জীবন-যাপন করত?

৭। পিরামিড কাকে বলে? ইহা কিভাবে তৈরী হত?

৮। সিন্ধু-সভ্যতার সঙ্গে আধুনিক ভারতীয় সভ্যতার কি কি সাদৃশ্য চোখে পড়ে?

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন :—

১। মেসোপটেমিয়া সভ্যতা উন্মেষের বিবরণ দাও।

২। মানব-সভ্যতায় সুমেরীয়দের অবদান সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৩। প্রাচীন মিশরের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে যা জান লিখ।

৪। বিশ্ব-সভ্যতায় প্রাচীন মিশরবাসীদের অবদান সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৫। সিন্ধু-সভ্যতার নিদর্শনগুলি উল্লেখ কর। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই সভ্যতার গুরুত্ব আলোচনা কর।

৬। নদী-মাতৃক সভ্যতার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি?

৭। মানব-সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যে রাজ্যে বা গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল কেন?

পঞ্চম অধ্যায়

দু-এক কথায় উত্তর দাও :—

১। প্রাচীন যুগের মানুষ লৌহ কোথা থেকে সংগ্রহ করত?

২। কারা প্রথম লোহার ব্যাপক ব্যবহার করে?

৩। ব্যাবিলনের নগর দেবতার নাম কি?

৪। ব্যাবিলন সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ রাজার নাম কি?

৫। হিকসস্‌দের তাড়িয়ে দিয়ে কে মিশরকে মুক্ত করেন?

৬। আহমোজ বংশের রাজধানী কোন নগরী?

৭। সাইরাস কোথাকার সম্রাট ছিলেন?

৮। জরথুস্ট্রের উপদেশ কোন পুস্তকে সঙ্কলিত হয়?

৯। খ্রীস্টানদের ধর্মগ্রন্থের নাম কি?

১০। ইহুদিরা কাকে তাদের আদি পুরুষ বলে মনে করে?

১১। ফ্যারাও-এর অদ্ভুত স্বপ্নের অর্থ কে বলে দিয়েছিলেন?

১২। খ্রীষ্টান সভ্যতার প্রধান শহরের নাম কি?